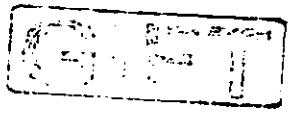

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বাংলা রূপকথা-উপকথায় মিথ-এর প্রভাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল
ডিগ্রির জন্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

448746

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
448746

গবেষক

মোছা: রাশনা শারমীন
রোল : ০৮, সেশন: ২০০১-২০০২

বিভাগ

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

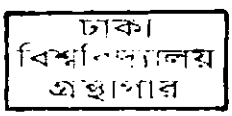

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, মোছা. রাশনা শারমীন, রেজি নং- ০৮, ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে আমার তত্ত্বাবধানে এমফিল-এ ভর্তি হয়। তার গবেষণার বিষয়- বাংলা রূপকথা-উপকথায় মিথ-এর প্রভাব। এই বিষয়ে তার উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণই তার মৌলিক রচনা। অভিসন্দর্ভটি এমফিল ডিগ্রী প্রদানের উপযোগী।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

448746

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রস্তাবনা	৫
প্রথম অধ্যায়	
বাংলা রূপকথার ধারা	৭
বাংলা উপকথার ধারা	২২
মিথ-এর প্রধান ধারাসমূহ	৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	
বাংলা রূপকথায় মিথ-এর প্রভাব	৫০
তৃতীয় অধ্যায়	
বাংলা উপকথায় মিথ-এর প্রভাব	১৩৬
উপসংহার	১৪৯
গ্রন্থপঞ্জি	১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

Dhaka University Institutional Repository

লৌকিক সংস্কৃতির অন্যতম বিশিষ্ট উপাদান লোককথা। যা মানুষের অতিলৌকিক কল্পনার ফসল। মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কোনো জনগোষ্ঠী বা কৌমের সৃষ্ট কাহিনীই সাধারণত লোককথা হিসেবে খ্যাত। বাংলা লোককথার অন্যতম অঙ্গ রূপকথা ও উপকথা।

মিথ বা পুরাণকথাও অনেক সময় লোককথার অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। যে সমাজ যত বেশি রক্ষণশীল এবং যাদের সমাজকাঠামো পরম্পরা-নির্ভর সেই সমাজে মিথ সত্যমূলক। মানুষ তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহে সব জাগতিক সমস্যার এক কাল্পনিক সমাধান খোঁজে তার পুরাণবৃত্তে; আর তাই মিথ হচ্ছে একটি জনগোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রামের সমস্যাবলির কাল্পনিক সমাধান আর অতীতের অভিজ্ঞতায় ভবিষ্যতের পথ নির্দেশের চেষ্টা। অনেকে মিথকে 'দেবদেবীর ইতিহাস'ও বলেন। আধুনিক বিচারে মিথ রূপকাশ্রয়ী অবাস্তব কাহিনীমাত্র এবং তার সত্যতা প্রশ্নযোগ্য। পুরাণকথা কালের প্রবহমানতার সঙ্গে লোকমুখে এবং কখনও সংকলিত হয়ে নিজস্ব ধারাকে অক্ষুণ্ন রেখেছে, কখনও লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে একেবারে নিছক নতুন লোককাহিনীর জন্ম দিয়েছে। লোককথা ও মিথ-এর সাজুয্যের কারণে এবং অপরাপর কিছু বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য বিবেচনায় অনেকে আবার লোককথাকে মনে করে থাকেন মিথ-এর ভগ্নাবশেষ। Solar Mythology বা Broken Down Myth তত্ত্বে যারা বিশ্বাসী, তাদের মতে সব লোককথারই সূতিকাগার মিথ। তবে এ ব্যাপারে বিতর্ক ও মতদ্বৈততা বিদ্যমান।

প্রসঙ্গক্রমে রূপকথা, উপকথা ও মিথ– তিনটি ধারাকে আমরা মূলত নিম্নোক্ত ধারণার আলোকে বিচার করব।

রূপকথা হলো এমন আনুপূর্বিক কাহিনী যার নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য আছে, আর আছে অনুকাহিনীর পরম্পরা। যেসব কাহিনীর ঘটনা ঘটে স্বপ্ন ও কল্পনার অবাস্তব পৃথিবীতে – যে পৃথিবীর না আছে নির্দিষ্ট স্থান, না আছে নির্দিষ্ট সময়, না আছে নির্দিষ্ট চরিত্র এবং যার কাহিনীকে অনেকে সত্য বলে মনে করে না।

যেসব কাহিনী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদি যেসব কাহিনীর মূলচরিত্র হিসেবে বিদ্যমান তাকে উপকথা বলা হয়। ইংরেজির Animals Tales কেই সাধারণভাবে আমরা উপকথা বলি। মানবেতর চরিত্র এখানে মানুষের মতো কথা বলে ও আচরণ করে। পশু-পাখির ইন্দ্রিয়ানুভূতি, ভাবপ্রকাশ এবং জীবনযাপন অনেকাংশে এখানে মানুষের মতো।

সৃষ্টির অজ্ঞাত লীলারহস্য অথবা জাতি বা গোষ্ঠীর বিকাশের কাহিনী বর্ণনা করে যে সকল অলৌকিক কাহিনী—আশ্রিত বিবরণ রচিত হয়ে থাকে তাকে সাধারণভাবে মিথ বলা হয়। মানুষ এসব কাহিনীকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং অনেক সময় চরিত্রগুলোর আরাধনা করে।

বাংলা রূপকথা ও উপকথায় মিথ-এর প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক সন্ধান বর্তমান গবেষণার বিষয়। এক্ষেত্রে প্রখ্যাত ভারতীয় মিথ তথা পুরাণকথা 'মহাভারত' ও 'রামায়ণ'-এর বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের রূপকথা ও উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর উপকথার মধ্যে প্রভাব খুঁজে বের করা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে বাংলা রূপকথার ধারা, বাংলা উপকথার ধারা ও মিথ-এর প্রধান ধারাসমূহ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলা রূপকথায় মিথ-এর প্রভাব, তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা উপকথায় মিথ-এর প্রভাব এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা রূপকথা-উপকথার সঙ্গে মিথ-এর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে রূপকথা, উপকথা ও মিথ-এর উদ্ভব, বিকাশ ও জনসমাজে এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রূপকথার ওপর মিথ-এর প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি, চিরদিনের রূপকথা ও ঠাকুরদার ঝুলি-এর সাথে ভারতীয় মিথ 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'-এর সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। গবেষণায় যেসব বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ করা হয়েছে তার বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে উপকথার ওপর মিথ-এর প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'চিরদিনের কথা' এবং ভারতীয় মিথ 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'-এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের প্রভাবের প্রেক্ষিতে বাংলা রূপকথা-উপকথার সঙ্গে মিথ-এর সম্পর্ক ।

এভাবে চারটি ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বাংলা রূপকথা ও উপকথার ওপর মিথ-এর প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা রূপকথার ধারা

Dhaka University Institutional Repository

যে কোনো সাহিত্যের একটি বিশাল অংশ জুড়ে আছে লোকসাহিত্য। অতি প্রাচীন কাল থেকে লোকসাহিত্য বিচিত্র ব্যাপকতায়, জীবনের সঙ্গে একাত্ম ঘোষণা করে আজও মানুষের সঙ্গে মিশে আছে। লোকসাহিত্য শব্দটির 'লোক' একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'লোক' বলতে কতগুলো মানুষকে বোঝানো হয় বা কতগুলো মানুষের বিশেষ অবস্থার কথা বলা হয়। মানুষের মধ্যে দুটো সত্তা বিদ্যমান– একটি হলো স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা, আরেকটি হলো সামাজিক বা গোষ্ঠীসত্তা। ব্যক্তি মানুষ এবং গোষ্ঠী মানুষের আচরণের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। একটি বিশিষ্ট পরিমণ্ডলে যারা সংহত গোষ্ঠীজীবনে বাস করত তাদেরকেই 'লোক' বলা হয়ে থাকে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তা-ই লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি মুখে মুখে সৃষ্টি হয়, স্মৃতির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয় এবং শ্রুতির মাধ্যমে এর বিস্তৃতি ঘটে। লোকসাহিত্যের অন্যতম ধারা হলো লোককথা বা লোককাহিনী যার ইংরেজি রূপ Folk-tale। লোককথা বলতে সেইসব কাহিনীকে বোঝায় যা মানুষ মুখে মুখে একে অন্যকে যুগ যুগ ধরে শুনিয়ে এসেছে। লোককথায় দীর্ঘতম অতিলৌকিক কাহিনী থাকে, যেগুলো বহু বছর ধরে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। লোককাহিনী মূলত মানুষের মনে আনন্দ সৃষ্টি করার জন্যে বর্ণনা করা হয়। এর মধ্যে এমন সব আকর্ষণীয় উপাদান থাকে যা সহজেই শিশু-কিশোর ও বৃদ্ধ মনকে অধিকার করতে সক্ষম হয়। লোককাহিনী শুনতে কিংবা বলতে সারা দুনিয়ায় মানুষ আনন্দবোধ করে। যা বিশেষজ্ঞদের মতে প্রায় তিন থেকে চার হাজার পূর্বে, এমনকী তারও পূর্বে জনপ্রিয় ছিল। স্টিথ থম্পসন এ সম্পর্কে বলেন

[আবদুল হাফিজ ১৯৭৬: ২] —

> মধ্য আফ্রিকার গ্রামাঞ্চলে, প্রশান্ত মহাসাগরে ভেলার মধ্যে, অস্ট্রেলিয়ার বনে-জঙ্গলে, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরির আশেপাশে অবস্থিত বসতিতে বর্তমান ও রহস্যময় অতীতকালের গল্প, হোক তা জীব জানোয়ারের, দেবতাদের কিংবা বীরদের অথবা নিজেদের মতো নরনারীদের তা সব সময়ই শ্রোতোকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে, তাদের প্রতিদিনের কথাবার্তাকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলা লোকসাহিত্যের যতগুলো শাখা রয়েছে তার মধ্যে লোককথা বা লোককাহিনী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লোককাহিনী পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে প্রচলিত বর্ণনামূলক গল্প। লোকসমাজই লোককাহিনীর সৃষ্টি করে। লোককথার মাধ্যমেও তাদের প্রকৃত পরিচয়ের খানিকটা রূপ পাওয়া যায়। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের গ্রামীণ সমাজের লোককথায় সেই সমাজের লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। অতিলৌকিক নানাকাহিনী লোককথার দেহ জুড়ে থাকে। লোককথার কয়েকটি ভাগ রয়েছে। রূপকথা এর একটি।

রূপকথার মূল ভিত্তি হলো অতিলৌকিক ও কাল্পনিক ভাবনা; স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পর্যন্ত গল্পের আখ্যানের সীমানা বিস্তৃত। দেব, দৈত্য, জিন, পরি, রাক্ষস, খোক্ষস, রাজা, প্রজা, সাধু, সন্ন্যাসী, পীর, ফকির, কৃষক, কিষাণী, তাঁতী, কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, ডাইনি, নদী, সাগর, পাহাড়, পর্বত, চন্দ্র, সূর্য, দিন, রাত্রি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সাধারণত রূপকথা রচিত হয়। এতে একক ও সরলরৈখিক গল্প যেমন আছে, তেমনি বিচিত্র শাখা সম্বলিত জটিল গল্পও রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রূপকথার সংজ্ঞা

জার্মান ভাষায় রূপকথাকে Marchen নামে অভিহিত করা হয়। Marchen শব্দটির ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে Fairy বা Household Tale দিয়ে, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এ দুটি শব্দ দিয়ে Marchen এর অর্থগত তাৎপর্য ফুটে ওঠে না। ফরাসিরা Marchen-এর পরিবর্তে ব্যবহার করেন Conte Populaire। স্টিথ থম্পসনের (Stith Thompson) মতে, 'আসলে Marchen বা Conte Populaire বলতে 'সিনড্রেলা' বা 'স্নো হোয়াইট' অথবা 'হ্যানসেল' এবং গ্রিটেল জাতীয় কাহিনীকে বোঝানো হয়েছে।' অন্যদিকে আলেকজান্ডার এইচ ক্রাপ এ ধরনের কাহিনীকে Fairy Tale-এর পর্যায়ে ফেলে আলোচনার পক্ষপাতী। Fairy Tale বলতে পরিকথা বোঝায়। স্টিথ থম্পসন এ প্রসঙ্গে বলেন যে, সব Fairy Tale-এর মধ্যে পরি থাকবেই এমন কোনো কথা নেই। তিনি মনে করেন যে, Fairy Tale বা Household Tale বলতে এমন বহুতর গল্প বোঝায় যে প্রায় সব কাহিনীই Marchen-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সে কারণে তিনি রূপকথা বলতে জার্মান Marchen শব্দটিকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। স্টিথ থম্পসন (Stith Thompson) Marchen-এর সংজ্ঞা দিতে দিয়ে বলেছেন *[আবদুল হাফিজ ১৯৭৬: ৬]*—

> A Marchen is a tale of some length, involving a succession of motifs or episodes. It moves in an unreal world without definite locality or definite characters and is filled with the marvellous. In this never land humble heroses kill adversaries, succed to kingdoms and mary princess.

অর্থাৎ Marchen হলো এক ধরনের কাহিনী যার নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য আছে, আর আছে মটিফ বা অনুকাহিনীর পরম্পরা। এই কাহিনীর ঘটনা ঘটে অবাস্তব পৃথিবীতে, যে পৃথিবীতে না আছে নির্দিষ্ট স্থান, না নির্দিষ্ট চরিত্র; তদুপরি তা অত্যদ্ভুত ব্যাপারে থাকবে পরিপূর্ণ। এই অসম্ভবের দুনিয়ায় নায়ক তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করে বাদশাহী পায় আর শাহাজাদীদের বিয়ে করে।

উপরি-উক্ত সংজ্ঞা যে সামগ্রিকভাবে বাংলা রূপকথার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলায় সাধারণভাবে রূপকাহিনীর পরিবর্তে 'কেচ্ছা' ও 'কিসসা' শব্দ দুটিও ব্যবহার করা হয়। আলেকজান্ডার এইচ. ক্রাপ (Alexander. H. Crup) প্রসঙ্গান্তরে না গিয়ে সরাসরি রূপকথাকে Fairy Tale হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এভাবে *[আবদুল হাফিজ ১৯৭৬: ৬]* —

> Fairy Tale বলতে আমরা বুঝি প্রবহমান এবং কিছুটা পরিমাণে দৈর্ঘ্য সংবলিত কাহিনী। মোটামুটি তা ঐকান্তিক, গদ্যে বিধৃত, তদুপরি হাসি-ঠাট্টাও তার থেকে বাদ পড়ে না। একজন নায়ক ও নায়িকা তাঁর কেন্দ্রে থাকে, শুরুতে এসব নায়ক-নায়িকা দরিদ্র ও নিঃস্বই থাকে। পরে অবশ্য অতিপ্রাকৃতিক উপাদানে পরিপূর্ণ অভিযাত্রায় বারংবার অংশগ্রহণ করে তারা বিখ্যাত হয়ে যায় এবং উদ্দেশ্য সাধনের পর পরবর্তীকালে সুখে দিন গুজরান করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম গবেষক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য রূপকথা সম্পর্কে বলেন *[আবদুল হাফিজ ১৯৭৬: ৭]*—

> বাংলায় যাহাকে রূপকথা বলা হয় তাহার কোনো ইংরেজি প্রতিশব্দ নাই। কাহারও কাহারও এই সম্পর্কে Fairy Tale কথাটি মনে হইতে পারে, কিন্তু Fairy অর্থ পরি, অতএব ইহা দ্বারা পরির গল্প বোঝায় কিন্তু বাংলার রূপকথায় পরি নাই। সুতরাং ইংরেজি Fairy Tale কথাটির বাংলায় রূপকথা অনুবাদ হইতে পারে না।

বাংলায় যেদিন মুসলমানেরা প্রবেশ করেছিল সেদিন তাদের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার লোককথায় প্রবেশ করেছে পরিরাও। ড. ভট্টাচার্য অবশ্য Marchen-এর পরিবর্তে 'রূপকথা'কে গ্রহণ করেছেন। ড. ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমরাও একমত যে, জার্মান Marchen-এর সমার্থক শব্দ হিসেবে রূপকথা গ্রহণযোগ্য তাতে পরি থাক আর নাই থাক, আর এই সঙ্গে আমরা রূপকথার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা হিসেবে মেনে নিতে পারি স্টিথ থম্পসনের সংজ্ঞাটিকে।

লোককথার মধ্যে রূপকথাই আকারে দীর্ঘতম। এর কারণ হলো, রূপকথার আঙ্গিক এমনই যে কথক ইচ্ছে করলে গল্পকে বাড়াতে পারেন। কাহিনীটি ঋজু নয় বলেই অনেক উপকাহিনী এর মধ্যে যুক্ত করা সহজ। যেমন– নায়ক অনেক বাধা পেরিয়ে পাতালপুরীতে রাজকন্যার সন্ধানে যাচ্ছে, কথক এ বাধাগুলির সংখ্যা নিজের ইচ্ছামতো বাড়িয়ে নিতে পারেন। কথকের ব্যক্তিগত অভিরুচি ও বিশ্বাস রূপকথাকে দীর্ঘায়িত করতে সাহায্য করে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, রূপকথা সবসময়ই দীর্ঘ হবে, তবে রূপকথাকে দীর্ঘ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

বিশ্বের যত রূপকথা সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ রূপকথায় কোনো চরিত্রের নাম থাকে না এবং এতে এক অজানা রাজ্যের বর্ণনা থাকে যেটিকে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা যায় না। 'এক যে ছিল রাজা, তার তিন রাণী' এইভাবেই রূপকথার কাহিনী এগিয়ে চলে। চারিত্রিক এই নির্বিশেষত্বের গুণে রূপকথার 'স্থানান্তর' খুব সহজেই ঘটে। গ্রামীণ মানুষ গল্পের আকাঙ্ক্ষায় সহজেই রূপকথাকে আপন করে নিতে পারে।

রূপকথায় একটি বিশেষ ছাঁচ রয়েছে। সব গল্পেই আরম্ভ ও শেষ প্রায় একই রকমের। রূপকথায় বিয়োগান্ত পরিণতি সাধারণত ঘটে না। রূপকথায় সবসময়ই সুখকর মিলন ঘটে। 'অতঃপর তাহারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করিতে লাগিল'– এই ধরনের মিলনাত্মক বাক্যের মধ্য দিয়েই শেষ হয় রূপকথার কাহিনী।

সকল রূপকথার মধ্য–অংশও প্রায় একইরূপে অগ্রসর হয় অর্থাৎ রূপকথার মধ্য–অংশে বিভিন্ন সংকট বর্ণিত হয় এবং এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্যে গল্পের নায়ক অনেক ভয়ানক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে। যেমন– অধিকাংশ রাজাকাহিনীমূলক রূপকথায় দেখা যায়, রাজার মস্ত বড় রাজ্য থাকে যেখানে সম্পদের কোনো অভাব থাকে না, কিন্তু রাজার সংকট থাকে যে তার কোনো সন্তান হয় না। দৈবক্রমে তার একাধিক রানির সকলেই একসঙ্গে সন্তান জন্ম দান করে, কিন্তু বিশেষ করে ছোট রানির সন্তান বিকলাঙ্গ অথবা

Dhaka University Institutional Repository

মানবেতর প্রাণী হয়। এই সন্তানকে ঘিরেই সকল কাহিনী আবর্তিত হয়। রূপকথার আদি, মধ্য ও অন্তে একইরকম ছাঁচ থাকায় রূপকথায় বড় একটা বৈচিত্র্য নেই।

রূপকথায় কথকের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়ে থাকে। যেমন– দেখা যায়, রানিরা নদীতে গোসল করে। যেহেতু কথক একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে নিজ অভিজ্ঞতানুযায়ী নদীতে গোসল করা ছাড়া তার পক্ষে আর অন্য কোনো উপায় ভাবা দুরূহ, তাই নিজের অভিজ্ঞতার আলোকেই তার বর্ণিত রূপকথার চরিত্ররা নদীতে গোসল করে। অর্থাৎ কথকেরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকেই রূপকথায় আরোপ করেন।

রূপকথায় যাদুমন্ত্র তথা অলৌকিকতার প্রভাব থাকে। এখানে অলৌকিক ঘটনা কিংবা যাদুমন্ত্রের দ্বারা অনেক অসাধ্য সাধন হয়ে যায়। অধিকাংশ রূপকথায় দেখা যায়, পানির ওপর দিয়ে মানুষ হাঁটছে কিংবা কোনো সন্ন্যাসীর দেয়া শেকড় বাটা অথবা ফল খেয়ে সন্তানধারণে অক্ষম নারীরা সন্তান জন্ম দিতে পারছে।

রূপকথায় বিভিন্ন রাজার পুত্রদের নাম বিভিন্ন ফল কিংবা মণিমুক্তার সাথে মিল রেখে রাখা হয়। যেমন– বাংলা রূপকথায় রাজপুত্রদের নামের মধ্যে রয়েছে মানিকরাজ, শঙ্খরাজ, মোতিলাল, ডালিমকুমার ইত্যাদি।

রূপকথার লোমহর্ষক কাহিনীতে যে সকল নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, অরণ্য-কান্তার অতিক্রম করে বিভিন্ন রাজপুত্র অগ্রসর হয়, তাদেরও কোনো নির্দিষ্ট নাম থাকে না কেবল একটি মাঠ ও একটি ঘাটের নাম কখনও কখনও শুনতে পাওয়া যায়, অনেক সময় তেপান্তরের মাঠ বা তিরপিনির মাঠের কথা উল্লেখ থাকে। তবে এগুলো কোথায় তা জানার জন্যে কারও কৌতূহল দেখা যায় না। এগুলো সম্বন্ধে এটুকু জানা যায় যে, এগুলো সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। এই জন্যে রূপকথাকে মহাকাব্য কিংবা এপিক-এর সঙ্গে তুলনা করে এসব রচনা প্রাচীনতর বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন।

রূপকথায় অতি সুন্দরী রাজকুমারীর উল্লেখ থাকে যার নাম আশেপাশের সকল রাজ্যের জানা থাকে। এই রাজকুমারীর বিয়ে করার শর্ত পূরণ করতে অনেক রাজকুমার আসে এবং তা নিয়েই গল্পের কাহিনী এগোয়। আবার অনেক সময় এই সুন্দরী রাজকুমারীরা অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়। তাদের উদ্ধার করতেই রাজপুত্ররা এগিয়ে যায় এবং অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে রাজকুমারীকে উদ্ধার করে। শেষ পর্যন্ত খুশি হয়ে রাজকুমারীরা ঐ রাজকুমারকে বিয়ে করে।

রূপকথায় বিভিন্ন অজানাপুরী যেমন– পাতালপুরীর উল্লেখ থাকে। যেটির অবস্থান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমুদ্রের নিচে হয়। সেখানে নানা রাজা, নানা রানি, রাক্ষস-খোক্ষস এবং ডাইনীরা বসবাস করে। এরা মানুষের রক্ত খেতে পছন্দ করে। এখানে সাধারণ মানুষ যেতে সাহস করে না।

রূপকথার নিজস্ব কিছু ভাষা রয়েছে। যেমন– তরোয়াল, জুতোয়া প্রভৃতি শব্দ। প্রায় প্রত্যেক রূপকথায় এসবের উল্লেখ পাওয়া যায়। রূপকথা সর্বদাই রূপকাশ্রিত হয়ে থাকে, সেজন্যে এর রূপকথা নামটি যথার্থই সার্থক। বাংলা লোকসাহিত্যের বিখ্যাত রূপকথা 'কাজলরেখা' কাহিনীর শুকপাখিও একটি রূপকমাত্র। শুকপাখি একদিন কাজলরেখার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে। এর অর্থ সেবা, ধৈর্য, সংযম ও নিষ্ঠার ভেতর দিয়ে রাজপুত্রই প্রকৃত কাজলরেখাকে চিনে নেয়। কাজলরেখা রাজপুত্রের যে সেবা করেছে, তা রাজপুত্র নিজের চোখে দেখতে পায় নি কারণ সে মৃত বা মৃতকল্প। কাজলরেখার চরিত্রের এই দিকটার পরিচয় তার নিজের চোখে চিনে নেয়ার প্রয়োজন ছিল। তা না হলে তাদের মিলন কেবলমাত্র রূপজ মোহের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতো। তাতে জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণ আসতে পারে না, সেবার মধ্য দিয়ে রাজপুত্র কাজলরেখার সেই পরিচয় যখন নিজে প্রত্যক্ষ করলেন তখন শুকপাখির পরিচয় দান অর্থহীন হয়ে পড়ে। দুঃখ ভোগই তপস্যা, এটিই চিত্ত শুদ্ধির উপায়। অতএব দুঃখের ভেতর দিয়ে মিলনই স্থায়ী কল্যাণের সন্ধান দেয়— এটিই কাজলরেখার শুকপাখির মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

রূপকথায় নীতিকথাও থাকে এবং দুষ্টদের শাস্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং রূপকথা বিশ্লেষণে দেখা যায়, রূপকথার কিছু সাধারণ বিষয় কতগুলি অভিন্ন পরিবেশের ভেতর দিয়ে ব্যক্ত হয়। এতে এই প্রকার একটি সংক্ষিপ্ত আদর্শ বা ছাঁচ নির্দেশ করা যায় যে, রূপকথায় কোনো অপুত্রক রাজা কোনো দৈব উপায়ে এক পুত্রলাভ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যে রাজপুত্র ভাগ্যের অন্বেষণে কিংবা কোনো রাজকন্যাকে উদ্ধার করার জন্যে দেশান্তরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। অতঃপর নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এক দুর্লভ রাজকন্যাকে লাভ করে। তারপর সেই রাজকন্যার অর্ধেক পিতৃরাজ্য লাভ করে সেখানেই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাজত্ব করতে থাকে। কোনো কোনো সময় তার নিজের পিতৃরাজ্যে ফিরে আসার কথাও শোনা যায়। অপুত্রক রাজার পুত্রলাভের মধ্যে যে দৈব উপায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারও কতগুলো বিশেষ ধারা রূপকথায় লক্ষ করা যায়। কোনো সন্ন্যাসী এসে রাজার মহিষীকে একটি ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন ফল বা শেকড় খেতে দেয়। রানি এক জন হলে সে একাই ফল বা শেকড়টি খেয়ে ফেলে। ফল শেকড়ের কোনো আঁশ, এমনকী বোঁটাটিও ফেলে দিতে বাধা থাকে কারণ তা ফেললে বিকলাঙ্গ কিংবা মানবেতর প্রাণীর সন্তানের জন্ম হয়, একাধিক রানি থাকলে সকলে তা ভাগ করে খায়। ভাগ করার ব্যাপারে কনিষ্ঠা রানিকে অন্যান্য রানিগণ নানাভাবে বঞ্চনা করে। এর ফলে তার গর্ভে বিকলাঙ্গ শিশু কিংবা পশু-পাখি জন্মগ্রহণ করে এবং অন্যান্য রানিদের গর্ভে পূর্ণাঙ্গ মানব সন্তান জন্মলাভ করে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা কনিষ্ঠা রানিকে তার সন্তানসহ রাজপ্রাসাদ হতে বিতাড়িত করেন। কিন্তু দেখা যায়, ছোটরানির বিকলাঙ্গ সন্তানই অলৌকিক শক্তির অধিকারী, পদে পদে সে অন্যান্য রাজপুত্রদেরকে বিপদ হতে রক্ষা করে। রাজা কালক্রমে সকল কথা জানতে পেরে কনিষ্ঠা রানিকে পুনরায় প্রাসাদে গ্রহণ করে নেয় এবং অন্যান্য রানি ও তাদের পুত্রদের জন্যে দন্ডের ব্যবস্থা করে। মাঝে মাঝে কনিষ্ঠা রানি ও তাদের সন্তানদের মধ্যস্থতায় দন্ডবিধান স্থগিত করা হয়।

সংজ্ঞা আলোচনাকালে রূপকথার যে সকল বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় সেগুলো হলো-

১. রূপকথা একটি অজানা জগৎ অর্থাৎ অনির্দিষ্ট স্থানের বা চরিত্রের মধ্য দিয়ে শুরু হয়।

২. ঘটনাপ্রবাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দিয়ে কোনো রূপকথার সূচনা ঘটে না। সমাপ্তিও অকস্মাৎ ঘটে না। শ্লথভঙ্গিতে আরম্ভ হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের পরে ও ধীরে-সুস্থে ঘটনাপ্রবাহ একটি স্থির বিন্দু পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

৩. রূপকথায় পুনরাবৃত্তি সর্বত্রই উপস্থিত থাকে, যা কাহিনীর অবয়বকে দান করে পূর্ণায়ত দৈর্ঘ্য।

৪. সকল রূপকথার আদি, মধ্য ও অন্ত কাহিনীতে একই ছাঁচ লক্ষ করা যায়।

৫. রূপকথায় পরস্পর বিরোধী চরিত্র পরস্পরের সম্মুখীন হয়, যেমন— নায়ক ও নায়কের শত্রু যথাক্রমে ভালো এবং মন্দ ব্যক্তি।

৬. রূপকথায় একই ভূমিকায় যদি দু জনকে দেখা যায় তখন অনেক সময় এরা হয় যমজ ভাই।

৭. সাধারণত সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিই শেষ পর্যন্ত রূপকথায় শ্রেষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণভাবে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নীই বিজয়ী বলে প্রমাণিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৮. রূপকথায় এক বা একাধিক উপকাহিনী বা ঘটনা সংস্থান থাকলেও তা কখনও জটিল হয় না।

৯. রূপকথার প্রায় সব কাহিনীর বিষয়বস্তু ও উৎকর্ষ প্রায় একই রকম হওয়ায় এ ধারায় তেমন বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় না।

১০. রূপকথায় অলৌকিকতা তথা যাদুমন্ত্রের প্রভাব থাকে।

১১. রূপকথায় ডাইনী ও রাক্ষস-খোক্ষসের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

১২. কথকের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী রূপকথার কাহিনী বর্ণিত থাকে।

১৩. রূপকথায় কখনও কখনও রহস্যময় পাতালপুরীর উল্লেখ থাকে।

১৪. অনেক রূপকথায় নেতিবাচক চরিত্রদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা থাকে।

১৫. রূপকথায় কখনও কখনও নীতিকথা প্রকাশিত হয়।

১৬. রূপকথায় গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনের বাস্তবচিত্রের প্রতিফলন ঘটে।

১৭. রূপকথার শেষে সুখকর মিলনের চিত্র প্রকাশিত হয়।

রূপকথার উদ্ভব ও বিকাশ

রূপকথা অত্যন্ত প্রাচীন ও ঐতিহ্যময়। রূপকথার উদ্ভব সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেয়া সম্ভব নয়। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, আদিম সমাজের লোকবিশ্বাস থেকেই রূপকথার জন্ম হয়েছে। রূপকথার মাধ্যমে সমকালীন সমাজের বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে। রূপকথায় আদিম সমাজের প্রতিফলনের রূপ বিশ্লেষণ করলেই রূপকথা উদ্ভব ও বিকাশের কিছুটা ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।

রূপকথায় আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য কম একথা স্বীকার করে নিলেও নিশ্চয়ই এর এমন কিছু আবেদন রয়েছে যার ফলে রূপকথা সকল জনগোষ্ঠীতেই খুব জনপ্রিয়। এই আবেদনটি হলো মানবিক। মানবিক আবেদনের পেছনে কাজ করেছে আদিম সাধারণ মানুষের যৌথ ইচ্ছাপূরণের তাগিদ। আপাত অবাস্তব অলীক ঘটনাবলির অন্তরালে বাস্তব জগতের সঙ্গে রূপকথার যোগসূত্রটি এভাবে ধরা পড়েছে। এর মধ্যে আদিম সমাজ তথা আমাদের সমাজেরও সামাজিক জীবন প্রতিফলিত হয়; না মেটা আশার রূপরেখার সন্ধান মেলে। সকল রূপকথায় সেই সমাজের সমাজচিত্র প্রতিফলিত হবেই। সুতরাং বলা যায়, আদিম সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করতে গিয়েই রূপকথার জন্ম হয়েছে।

বাংলা রূপকথায়ও সমস্ত রূপক ও বর্ণনা বাহুল্যের অন্তরালে আমাদের বঙ্গদেশের পরিবার ও সমাজের একটি দূরবর্তী ছবি পাওয়া যায়। আদিম বঙ্গদেশের পারিবারিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো কল্পনার উজ্জ্বল বর্ণে দূরবর্তী হয়ে আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়। রূপকথার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান করা স্বাভাবিক না হলেও ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের মনস্তত্ত্ব, জীবন কর্মধারা ও মানসিক ভাবনার সন্ধান এখানে পাওয়া যায়। সমাজ বিবর্তনের ধারায় সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন অভিজ্ঞতাকে রূপকথার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

রূপকথার স্রষ্টাগণ কাহিনীর মধ্যে যৌথ বুদ্ধি ও শক্তির কথা ঘোষণা করলেও কোনো ব্যক্তি মানুষের ভূমিকাকেও অস্বীকার করতে দেখা যায় না, এর কারণ হলো সমাজে এমন এক একজন থাকেন যিনি মন-মনন, চতুরতা, দৈহিক শক্তি ও আত্মত্যাগে অনন্য। সামাজিক মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সচেষ্ট থাকেন এই ধরনের ব্যক্তিকে গল্পে আনতে। বাস্তব জগতে এইসব মানুষ সমাজবদ্ধ সকল মানুষকে অনুপ্রাণিত করে,

Dhaka University Institutional Repository

এদের আদর্শ তাদেরকে উদ্দীপনা জোগায়; কিন্তু এ ধরনের মানুষ সকল সমাজে পাওয়া দুর্লভ। তাই রূপকথা সৃষ্টির মাধ্যমে গোষ্ঠীমানুষ এমন আদর্শবান চরিত্রের কার্যাবলি অংকন করে যাকে সে সমাজে পেতে চায়।

রূপকথার উদ্ভবের পেছনে আদিম সমাজের ইচ্ছাপূরণের তাগিদ ছিল। আদিম সমাজ সবসময়ই বিপদ-সংকুলতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করত। পশু-পাখির ভয়ে সব সময় ভীতসন্ত্রস্ত থাকত। তাই তারা রূপকথায় এমন এক নায়ককে কল্পনা করেছে, যে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অন্যের উপকার করে, পশুশক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করে সমাজকে রক্ষা করে বিপন্নদের উদ্ধার করে। এসব সনাতন গুণের পূজারী হলো লোকসমাজ, তাই আদর্শ মানুষের চিত্র এঁকে তারা তৃপ্তি বোধ করত।

আদিম সমাজ নিয়তিতে বিশ্বাস করত। তাদেরকে যে অদৃশ্য শক্তি পরিচালিত করে এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহ ছিল না। তাই তাদের সৃষ্ট রূপকথায় নিয়তি বা অদৃষ্টের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অন্যদেশের রূপকথার চেয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত রূপকথায় নিয়তির ভূমিকা অনেক গভীর ও ব্যাপক। নিয়তির স্থান ভারতীয় ঐতিহ্যে ও সংস্কৃতিতে যে কত ব্যাপক তার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে। তাই ভারতীয় রূপকথায়ও যে নিয়তি অতিমাত্রায় প্রাধান্য বিস্তার করেছে তা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। এই নিয়তি রূপকথার কাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে এবং গল্পের মোড় ফিরিয়ে দেয়।

রূপকথা বলার ইতিহাস ইতিহাসের চেয়েও প্রাচীন, রূপকথা কোনো দেশ ও সভ্যতার সীমানায় আবদ্ধ নয়। বিষয় পরিবর্তিত হয়ে যায় দেশে দেশে, উদ্দেশ্যও হয়তো ভিন্নতর; কিন্তু সামাজিক ও ব্যক্তিগত চাহিদার মূলগত কোনো তফাৎ নেই রূপকথাতে। একটি অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা রূপকথার মধ্যে ধ্বনিত হয় বলেই ধর্মীয় কিছু বিশ্বাস রূপকথার কাহিনীর মধ্যে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে রয়েছে। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের আলোকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে রূপকথা উদ্ভবের পেছনে সামাজিক মানুষের ধর্মচেতনা কাজ করেছে বলা যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ রূপকথায় রয়েছে – রাজপুত্র অনেক বাধা পেরিয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে, তারপর বিয়ে করে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা পেয়ে সে আর পিতৃরাজ্যে ফিরে আসে না। তাই রূপকথায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রভাব রয়েছে বলে অনুমান করা অমূলক নয়।

রূপকথায় ভূতপ্রেত কাহিনীর উদ্ভব সম্পর্কেও কোনো নিশ্চিত ধারণা গড়ে তোলা দুরূহ। প্রাগৈতিহাসিক নানা আদিম বিশ্বাসের প্রত্নকণিকায় সম্ভবত এই ভূতের অস্তিত্ব ক্রিয়াশীল। আদিমকাল থেকে বর্তমান অবধি সংস্কৃতির নিরবচ্ছিন্ন যে ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে, তার মধ্যে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে গতিশীল হয়ে আছে নিজস্ব পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে অজস্র চিন্তার অসংখ্য কল্পিত সমাধান। বিশ্বাসটির মূল হলো 'সর্বপ্রাণবাদ'। তাদের বিশ্বাস যে, আকাশ, মাটি, জল, হাওয়া, গাছ, পাহাড় প্রভৃতি যাবতীয় নৈসর্গিক ঘটনার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক অলক্ষ্য শক্তি। ঐ অলক্ষ্য শক্তির সূত্রে যেমন এসেছে প্রকৃতির উপাসনা, দেবতার কল্পনা, যাদুশক্তিতে আস্থা; ঠিক তেমনি আসছে মৃতের আত্মার অবিনশ্বরতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রতীতি। প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই এর সৃষ্টি। এইভাবেই মগ্নচৈতন্যের অতলে অনির্দেশ্য ভয়ের উত্তরাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জন্ম দিয়েছে 'আত্মা' নামক ধারণাটি। আদিভৌতিক ধ্যান ধারণায় প্রভাবিত পূর্বপুরুষগণ তাদের জীবনে অপরিহার্য নানা ধরনের নৈর্ব্যক্তিক শক্তিকে উপলব্ধি করেই কেবল ক্ষান্ত থাকে নি; তারা চলেছে এদের অবলোকন করতে, প্রত্যক্ষ অবলোকনের মাধ্যমে এই শক্তির কাছাকাছি যেতে এবং রূপলাভে ধন্য হতে। সে কারণেই আপন দৈহিক রূপকে আরোপিত করেছে এই সব বিদেহী চরিত্রে। এর ফলেই অতিপ্রাকৃত ভূতপ্রেতের তথা বিদেহী শক্তির নবত্বারোপ ঘটেছে রূপকথার কাহিনীতে।

Dhaka University Institutional Repository

রূপকথায় রাক্ষস-খোক্ষসের গল্পগুলোর উদ্ভব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, মৃত্যুর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ভীতি থেকে এগুলোর জন্ম হয়েছে। যখনই আমরা কোনো রাক্ষস-খোক্ষসের অত্যাচার এবং এসব অত্যাচার হতে কোনো রাজপুত্র কর্তৃক পরিত্রাণের কথা শুনি, তখনই আমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। যে অশরীরী প্রেতাত্মা নানাভাবে মানুষের ভীতির উৎপাদন করে থাকে বলে মনে হয়, রাক্ষস-খোক্ষস তাদেরই কল্পরূপমাত্র। এই সকল কাহিনী পরিকল্পনার মূলে লোকসমাজের মৃতের প্রতি স্বাভাবিক ভীতি ও এগুলোর কবল হতে পরিত্রাণ পাওয়ার অভিব্যক্তি কাজ করেছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে বাস করত, তখন সর্বদাই প্রবলতর শক্তিশালী দল দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার বিভীষিকা দেখত। সেই প্রবলতর জাতি সম্পর্কিত তাদের ভীতির মনোভাব রাক্ষস-খোক্ষসের কাহিনীগুলোর ভেতর দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। মৃত্যুভয়ই হউক কিংবা প্রবলতর জাতি কর্তৃক আক্রমণের ভয়ই হউক, আদিম সমাজের ভীতির একটি অনিশ্চিত ক্ষেত্র হতেই যে এই ধরনের রূপকথার উদ্ভব হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সংশয় থাকার অবকাশ নেই।

রূপকথার বৈচিত্র্য

রূপকথায় সাধারণত রাজা-রানি, রাক্ষস-খোক্ষসের কাহিনী বর্ণিত হয়। এরই সঙ্গে থাকে- ভূতপ্রেতের কথা, মানব ও ভূতের পারস্পরিক সম্পর্ক, সংসার, ধাঁধা, আজগুবি, কিংবদন্তীর কথা।

ভূত শব্দটির অর্থ হলো যা ফুরিয়ে গেছে কিন্তু যার আদল লুপ্ত হয় নি। অর্থাৎ ভূত শব্দটির তদ্ভব রূপ ভুয়ো। ভুয়ো মানে যার ভেতর সারবস্তু কিছুই নেই তবে বাইরের আবরণের আদল আছে। ভূত যেন মরা মানুষের না মরা ছাঁচ।

স্টিথ থম্পসন বলেছেন *[অন্তরামিত্র ২০০৪: ৫২]*—

> There is so much variety is the general concept of ghost that one can hardly make an exact definition of it.

বাংলা রূপকথার ক্ষেত্রে এই ভূতপ্রেতের চরিত্র অবলম্বনকারী গল্পগুলো রোমাঞ্চকর কাহিনীর জন্যে শিল্প-সার্থক। এইরকম গল্পে অনেক ধরনের ভূতের সাক্ষাৎ মেলে, তারা সাধারণত পরোপকারী হয়। অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে, মানবকে বিপদের পূর্বাভাস দিতে অথবা রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে রূপকথায় এসব ভূতকে দেখা যায়। তবে অনেক ভূতমূলক রূপকথায় মানুষের গৃহজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা অনিষ্টকারী ভূতেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বহু গল্পে মানব, ভূতপ্রেত এবং ঐশ্বর্য এক সূত্রে গ্রথিত।

পরম্পরা, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ঐতিহ্য বাঙালি জাতি বা গোষ্ঠীমানসে সুনির্দিষ্ট কতকগুলি মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছে, তারই উৎকৃষ্ট ফসল সাংসারিকধর্মী রূপকথাগুলো। সাংসারিক রূপকথাগুলো অনেক ধরনের হতে পারে। যেমন– বোকাদের কথা, চালাকদের কথা গার্হস্থ্য জীবনকেন্দ্রিক কাহিনী ইত্যাদি। স্টিথ থম্পসন এই জাতীয় বোকামির রূপকথাগুলোকে Numskull Tale আখ্যা দিয়ে বলেছেন *[অন্তরা মিত্র ২০০৪: ৫৯]*—

> Important themes producing these popular jests are the absurd acts of foolish person.

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রিয় এই কাহিনীগুলোতে নির্বুদ্ধিজনিত অসঙ্গতিই হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছে। এই ধরনের রূপকথায় কাহিনীর আরম্ভে চূড়ান্ত বোকামির পরিচয় নায়ককে প্রতিমুহূর্তে হাস্যস্পদ করে তোলে; কিন্তু এই বোকামিই গল্প শেষে তাকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দেয়।

রূপকথায় বোকামি আর চালাকির গল্প পাশাপাশি অবস্থান করে। একপক্ষের বোকামি অন্যপক্ষের বুদ্ধিমত্তাকেই প্রকট করে তোলে। এই ধরনের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কৌশলী প্রতারণা ও বিচিত্রপন্থী চাতুর্যের নানা নিদর্শন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সাধারণত দরিদ্র বা নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের পীড়িত-লাঞ্ছিত মানুষের দলই এই কৌশলী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

গার্হস্থ্য জীবনের রূপকথাগুলোতে বাঙালির হাসি কান্না দুঃখ-সুখে ভরা দৈনন্দিন জীবনই প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। সামাজিক সম্পর্কের যাবতীয় টানাপোড়েন থেকে শুরু করে প্রেম, বিচ্ছেদ উপস্থিত বুদ্ধি, কৃষিমাহাত্ম্য, পরিশ্রম, বুদ্ধি ও চাতুর্যের পুরস্কার ইত্যাদি বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকেই এই ধরনের রূপকথাগুলো কথিত। অর্থাৎ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির বলে জীবনের সর্ববিধ অবস্থা থেকে সাংসারিক রূপকথাগুলোর উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। সাংসারিক রূপকথাগুলোতে গৃহস্থ পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্র অথবা কনিষ্ঠ বধূর প্রতি পক্ষপাতিত্ব ফুটে ওঠে। গল্পের প্রারম্ভে যে কনিষ্ঠ পুত্র অকর্মণ্যতার জন্যে অথবা ছোট বৌ নির্বুদ্ধিতার জন্যে পরিবারের ও সমাজের সদস্যদের কাছে লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়, গল্পের শেষে তারাই বিপুল সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিকার লাভ করে।

সাংসারিক রূপকথাগুলোতে অলৌকিক ঘটনা বা আকাশচারী কল্পনার নিদর্শনও থাকে। তবে তা গল্পের নিয়ামক হয় না। শারীরিক পরিশ্রম এবং বুদ্ধির চাতুর্যকে মূলধন করেই নায়ক বা নায়িকা সাহসের সঙ্গে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে এবং পরিশেষে পুরস্কারস্বরূপ অলৌকিক শক্তির আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।

বাংলার বহু রূপকথার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে নানা সমস্যামূলক জিজ্ঞাসা যার ব্যাখ্যাই গল্পের সুষ্ঠু সমাধান রচনা করে। এগুলোকে ধাঁধামূলক রূপকথা বলা হয়। ইংরেজিতে *'Enigma'* জাতীয় রচনার সঙ্গে এই ধাঁধামূলক লোককথার তুলনা করা যায়, ধাঁধামূলক কথায় যাবতীয় রস কেন্দ্রীভূত থাকে সমস্যাটির সমাধানে। শ্রোতার অনুসন্ধিৎসু কৌতূহল কথকের বক্তব্যের সূত্র ধরে সমাধানের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলে। এ ধরনের গল্পে সমস্যাটির রস সম্যক অনুধাবনের জন্যে কেবল শ্রুতি নয়, প্রয়োজন হয় বুদ্ধি ও মননধর্মী বিশ্লেষণ। ধাঁধামূলক কথাগুলো কখনও নীতি উপদেশ বিতরণ করে; কখনও বা বুদ্ধি প্রতিযোগিতায় আবাহন করে, কখনও আবার বাককুশলতার পরিচয় দানের মাধ্যমে উপভোগ্য হাস্যরস সৃষ্টি করে। এছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাগযুদ্ধ কিংবা গল্প করে প্রশ্ন ও শ্রোতার উত্তর দানের মাধ্যমে জীবনের বহুবিধ সৎমূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করে দৃঢ়ভাবে।

রূপকথায় অপার্থিব, কাল্পনিক উপাদানের পাশাপাশি আজগুবি কথায় উদ্ভট কল্পনারসের আধিক্য দেখা যায়। ইংরেজিতে যাদের বলা হয় 'Tales of lying' যেমন– বাইশ জোয়ান আর তেইশ জোয়ান পালোয়ান তালগাছ ও বটগাছ দিয়ে দাঁতন করে। চাষীগৃহস্থ ট্যাকের মধ্যে সাত শো মোষ বয়ে আনে। এই অতিলৌকিক ও কাল্পনিক ভাবনা রসে আর্দ্র ঘটনাগুলো লোকসমাজের চিরন্তন ক্ষমতার বিশেষ এক মাত্রাকেই ফুটিয়ে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ কোনো স্থান বা ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত বিচিত্র জনশ্রুতিকে কিংবদন্তীধর্মী লোককথা বলা হয়। সত্য বা অর্ধসত্য কাহিনী, জনশ্রুতি, বিচিত্র গুজব নিয়েই এই ধরনের কাহিনী গড়ে উঠেছে। কিংবদন্তীমূলক কথা গড়ে ওঠে কোনো অসাধারণ বিষয় বা ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে। মানব মনের অবচেতনে সর্বদাই অতিলৌকিক সাধারণাতীত কিছু সম্পর্কে একটা ভয়, একটা অনিবার্য কৌতূহল থাকে, সেইসব কিছু মিলেই বাস্তব ইতিহাসের কাঠামোর ওপর বহিরাঙ্গের কাহিনী সৌধটি গড়ে ওঠে। উৎস মূলের বাস্তব ঘটনাটির সঙ্গে সম্পর্কিত স্থান-কাল-বস্তু অথবা মানুষের প্রসঙ্গে কালক্রমে এক একটি কিংবদন্তীমূলক কথার জন্ম হয়।

উপরি-উক্ত ধারাগুলো রূপকথার মধ্যে বিরাজিত থাকলেও সামগ্রিকভাবে বাংলা রূপকথায় রাজা-রানিমূলক কথারই বেশি প্রচলন রয়েছে। এই ধরনের গল্পে রাজ্য, রাজা-রানি, রাজপুত্রের কাহিনীর সঙ্গে রাক্ষস-খোক্ষস জড়িয়ে থাকে।

রূপকথার বিশাল ভাণ্ডার সম্পর্কে সহজেই পরিচয় সাধনের জন্যে আন্টি আর্নে ও স্টিথ থম্পসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তারা রূপকথার যে টাইপ ইনডেকস করেছেন তা হলো *[দিব্যজ্যোতি মজুমদার ১৯৯৩: ৯০, ৯১, ৯২,৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭]*—

ক. মূলভাগ

১.	৩০০-৩৯৯	অলৌকিক বাধা
২.	৪০০-৪৫৯	অলৌকিক বা মোহময় স্বামী, মোহমীয় স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়
৩.	৪৬০-৪৯৯	অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কার্য, অসাধ্য সাধন
৪.	৫০০-৫৫৯	অলৌকিক সাহায্যকারী বা সাহায্যকারিণী
৫.	৫৬০-৬৪৯	যাদু বা ঐন্দ্রজালিক বস্তু
৬.	৬৫০-৬৯৯	অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান
৭.	৭০০-৭৪৯	অন্যান্য অলৌকিক কাহিনী
৮.	৭৫০-৮৪৯	রোমাঞ্চকর বা রোমান্টিক কাহিনী
৯.	৮৫০-৯৯৯	বোকা রাক্ষসের কাহিনী
১০.	১০০০-১১৯৯	স্বামী স্ত্রী

এই মূল ভাগের মধ্যে বাংলা রূপকথার কয়েকটি অতিপরিচিত টাইপ ইনডেকসের সংখ্যাসহ তালিকা দেয়া হলো–

Dhaka University Institutional Repository

১. অলৌকিক বাধা

৩০০. রাক্ষস-রাক্ষসীকে মেরে ফেলা

৩০১. তিনজন চুরি হওয়া রাজকন্যা

৩০২. ডিমের মধ্যে রাক্ষসের কলিজা

৩০৩. যময ভাই

৩০৪. শিকারী

৩১০. প্রাসাদ চূড়ায় রাজকন্যা

৩১১. বোনকে উদ্ধার করা

৩১৩. নায়কের পলায়নে নায়িকার সাহায্য

৩১৪. মানুষের ঘোড়ায় রূপান্তরিত হওয়া

৩১৫. অবিশ্বাসী বোন

৩১৫. খ অবিশ্বাসী স্ত্রী

৩২৫. যাদুকর ও তার শিষ্য

৩২৭. শিশুরা ও রাক্ষস

৩২৭ খ বামন ও দৈত্য

৩২৭ গ দৈত্য বা ডাইনি নায়ককে থলিতে ভরে নিয়ে যায়

৩২৮ নায়ক দৈত্যের ধনরত্ন চুরি করে

৩২৯ দৈত্যের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা

৩৩০ কামার দৈত্যকে বোকা বানায়

৩৩৫ মৃত্যুর দূত

২. অলৌকিক বা মোহময় স্বামী, মোহময়ী স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়

৪০০ নিখোঁজ স্ত্রীর সন্ধান

৪০২ ব্যাঙ কনে বৌ

৪০৩ কালো ও ফরসা কনে বৌ

৪০৩ ক ইচ্ছা

৪০৩ গ ডাইনি কনের বদলে নিজের মেয়েকে উপস্থিত করে

৪০৭ ফুলের রূপ নেয় মেয়ে

৪২৫ নিখোঁজ স্বামীর সন্ধানে

Dhaka University Institutional Repository

৪২৫ ক বরের বেশে জন্তু বা দৈত্য

৪৩১ বনের মধ্যে বাড়ি

৪৩২ পাখির রূপে রাজপুত্র

৪৩৩ সাপের রূপে রাজপুত্র

৪৫০ ছোট ভাই ও ছোট বোন

৪৫১ বোন ভাইকে খুঁজছে

৩. অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কার্য, অসাধ্য সাধন

৪৬০ খ ভাগ্যের খোঁজে যাত্রা

৪৬৫ ক অজানার পথে যাত্রা

৪৭০ জীবনে ও মরণে বন্ধু

৪৭৩ খারাপ নারী বা খারাপ সৎমায়ের শাস্তি

৪৮০ চরকা বুড়ি

৪. অলৌকিক সাহায্যকারী বা সাহায্যকারিণী

৫০০ সাহায্যকারীর নাম

৫০১ তিনজন সাহায্যকারিণী বুড়ি

৫০২ বনের মানুষ

৫০৫ প্রতারিত রাজা

৫০৬ উদ্ধার পাওয়া রাজকন্যা

৫০৬ খ দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া রাজকন্যা

৫০৭ গ সাপকন্যা

৫১৩ কয়েকজন সাহায্যকারী

৫১৮ দৈত্য যাদুবস্তুর ওপর দিয়ে উড়ে যায়

৫১৯ খাড়ারনী কনে বৌ

৫৫২ যে মেয়েরা পশুকে বিয়ে করেছিল

৫৫৪ কৃতজ্ঞ পশু

৫৫৫ জেলে ও জেলে বৌ

Dhaka University Institutional Repository

৫. যাদু বা ঐন্দ্রজালিক বস্তু

৫৬০ যাদু আংটি

৫৬৬ তিনটি যাদু বস্তু ও অদ্ভুত ফল

৫৬৭ যাদু পাখির কলিজা

৬১০ রোগ নিরাময়ের ফল

৬১১ বামনের উপহার

৬১৩ দুই পথিক

৬২০ উপহারসমূহ

৬. অন্যান্য অলৌকিক কাহিনী

৭০৫ মাছ থেকে জন্ম

৭০৮ বিস্ময়বালক

৭১১ সুন্দর ও কুৎসিত যমজ ছেলে

৭২৫ স্বপ্ন

৭৩৫ ধনী ও গরিব মানুষের ভাগ্য

৭৩৬ ভাগ্য ও ধনরত্ন

৭. রোমাঞ্চকর বা রোমান্টিক কাহিনী

৮৫০ রাজকন্যার জন্মচিহ্ন

৮৫১ যে রাজকন্যা ধাঁধার সমাধান করতে পারছে না।

৮৭০ ক ছোট হংসী কন্যা

৮৭৫ চালাক চাষীর মেয়ে

৮৮০ বৌয়ের জন্যে অহংকার

৮৮৪ পরিত্যক্ত প্রেমিক অথবা প্রেমিকা

৮৮৮ বিশ্বাসী বৌ

৮৯২ রাজপুত্ররা

৯১০ ক অভিজ্ঞতার মাধ্যম জ্ঞান

৯১০ খ ভৃত্যের ভালো পরামর্শ

৯২১ রাজা ও চাষীর ছেলে

৯৩০ ভবিষ্যৎবাণী

৯৪৫ ভাগ্য ও বুদ্ধি

Dhaka University Institutional Repository

৯৪৫ ক রাজা ও ডাকাত

৮. বোকা রাক্ষসের কাহিনী

১০৪৯ ভারী কুঠার

১০৬২ পাথর ছোড়া

১০৭৪ দৌড়

১০৮৮ খাওয়ার প্রতিযোগিতা

১১৩৭ রাক্ষসকে অন্ধ করে দেওয়া

৯. স্বামী-স্ত্রী

১৩৫০ ভালো বৌ

১৩৬৫ খারাপ ও একরোখা বৌ

১৩৮০ অবিশ্বাসী বৌ

১৪০৫ কুঁড়ে তাঁতী বৌ

১৪০৮ যে স্বামী বৌয়ের কাজ করে দেয়

এছাড়াও পরিদের নিয়ে মৌখিক সৃষ্ট কাহিনীগুলোকেও রূপকথার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেসব বাংলা পরিকথা অতি পরিচিত সেগুলোর মোটিফ ইনডেকস্ হলো–

এফ ২০০ পরি

এফ ২১০ পরির দেশ

এপ ২১৩ দ্বীপের মধ্যে পরির রাজ্য

এফ ২৫১ পরির জন্ম কথা

এফ ২৫২.২ পরিরানি

এফ ২৬১ নৃত্যরতা পরি

এফ ২৬৫ স্নানরতা পরি

এফ ৩৭০ পরিরাজ্যে গমন

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা উপকথার ধারা

Dhaka University Institutional Repository

লোককথা বিশ্লেষণে দেখা যায়, এর মধ্যে বিচিত্র কাহিনী রয়েছে। এই বিচিত্র শ্রেণীকে লোককথা গবেষকগণ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন তন্মধ্যে একটি হলো উপকথা, যা পশুকথা নামেও পরিচিত। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Animal tale.' লোককথা বিশ্লেষণের নৃবিজ্ঞানজাত পদ্ধতিতে বলা হয়, লোককথা তথা লোকসাহিত্যের মধ্যে উপকথা হলো সবচেয়ে প্রাচীন।

উপকথার সংজ্ঞা

পশু-পাখির চরিত্র অবলম্বন করে যে সকল কাহিনী রচিত হয়ে থাকে তাদেরকে সাধারণভাবে উপকথা বলে অর্থাৎ পশু-পাখিকে কেন্দ্র করে যেসব লোককাহিনী গড়ে ওঠে তাকে উপকথা বলা হয়। তবে কাহিনীতে পশু-পাখি থাকলেই তা উপকথা হবে না। উপকথার মূল চরিত্র হবে পশু-পাখি এবং তাকে ঘিরেই আবর্তিত হবে মূল কাহিনী। *'Standard dictionary of Folklore Mythology and Legends'*-এ উপকথা সম্পর্কে বলা হয়েছে *[অন্তরা মিত্র ২০০৪: ৪৭]*—

> A story having animals as it's principal characters one of the oldest forms, perhaps the oldest of the folk tale and found everywhere on the globe at all levels of culture.'

অর্থাৎ উপকথার প্রধান চরিত্রে পশু-পাখির ভূমিকা কার্যকর এবং পৃথিবীব্যাপী এই ধরনের লোককথাই সম্ভবত প্রাচীনতম সৃষ্টি এবং এই প্রাচীনত্বের অনুসন্ধানে পৌঁছে যেতে হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগে।

উপকথার স্বরূপ উন্মোচনে স্টিথ থম্পসন বলেছেন *[অন্তরা মিত্র ২০০৪: ৪৮]*—

> Amimals appear in myths especially those of primitive peoples where the culture hero often has animal form though, he may be conceived of as acting and thinking like a man or even on occasion of having human shape. Animals also appear where the tale is clearly not in the mythical cycle. It is such non mythical story that we designate by the simple term animal tales. They are designed usually to show the cleverness of one animal and the stupidity of another and their interest usually lies in the humour of the deceptions or the absurd predicaments the animals stupidity leads him into.'

Dhaka University Institutional Repository

উপকথা হলো সেই জাতীয় অলৌকিকতাযুক্ত পশুকেন্দ্রিক গল্প যেখানে পশু-পাখির আকৃতি নয়, স্বভাবগত বিশেষত্বের ওঠা-পড়ায় গল্পরস জমাট বাঁধে। এই স্বভাব আবার মানবীয় নানা অনুভূতির প্রতিচ্ছবি। প্রত্যেক দেশের উপকথাতে সে দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবরণ উঠে আসে। উপকথায় কাক, চড়ুই, হাতি, পিঁপড়ে, বাঘ, শিয়াল, কুমীর প্রভৃতির আধিক্য লক্ষ করা যায়।

উপকথা পশু-পাখি নির্ভর হলেও এতে মানবচরিত্র যে একেবারে নেই তা নয়। তবে উপকথায় মানবচরিত্রের ভূমিকা থাকে গৌণ। পশুচরিত্রগুলোর ধূর্ততা প্রকাশ করার জন্যেই মানবচরিত্রগুলোর সন্নিবেশ করা হয়, এখানে পশুচরিত্রের কাছে মানবচরিত্রগুলো হয়ে পড়ে অসহায়।

উপকথাকে আসলে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় বোঝানো বেশ দুরূহ । উপকথায় যে বৈশিষ্ট্য প্রথমেই লক্ষণীয় সেটি হলো এতে যে পশুকে ঘিরে কাহিনী আবর্তিত হয় সেই পশুটির অবস্থান সম্পর্কে একটি অনির্দিষ্ট ধারণা দেয়া হয়। যেমন- 'এক যে ছিল শিয়াল' 'এক যে ছিল বাঘ, 'এক বনে এক বাঘ থাকত' এই ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে উপকথার কাহিনী শুরু হয়। উপকথায় পশু-পাখিগুলো মানবীয় আচরণ করে। পশু-পাখিরা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম। অনেক উপকথায় দেখা যায়, বিভিন্ন প্রাণী বিশেষ করে শিয়াল পাঠশালা খুলে এবং এই পাঠশালাতে বিভিন্ন পশু-পাখি পড়তে আসে, আবার দেখা যায় বিভিন্ন প্রাণী মানুষের মতোই চাষাবাদ করে।

উপকথায় রূপকের আশ্রয় থাকে। এতে বিভিন্ন পশুকে উপস্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় বোঝানো হয়। যেমন– বাংলা উপকথায় শিয়ালকে ধূর্ত ও চালাকের রূপকে এবং কুমীরকে নির্বোধের রূপকে বর্ণনা করা হয়।

উপকথার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো হাস্যরসাত্মক। হাস্যরস সৃষ্টি করাই উপকথার অন্যতম উদ্দেশ্য। উপকথার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কৌতুকপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনী। উপকথার আরেকটি বৈশিষ্ট্য নীতি প্রচার করা, মানুষের মনে নীতিবোধ জাগ্রত করার প্রয়াস নিয়েই উপকথার সৃষ্টি হয়েছে বলে লোককথা গবেষকগণ মনে করেন।

উপকথার মানবচরিত্রগুলোর তেমন কোনো পরিচয় থাকে না। কেবল অনির্দিষ্ট কোনো এক জোলা, এক নাপিত, এক বামুন বুড়ী, এক বর - এভাবে চরিত্রগুলো উল্লেখ করা হয়। তবে তাদের সম্পর্কে এছাড়া কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। বিভিন্ন উপকথায় সাধারণত এইকটি মানবচরিত্রই পাওয়া যায়। তবে দেখা যায় সাধারণত জোলা নির্বোধ, নাপিত ধূর্ত, ব্রাহ্মণ দরিদ্র ও লোভী, আর বরের বেলায় দেখা যায় সে বিয়ে করে, কিন্তু কৌশলে পশুরা বিশেষ করে শিয়াল ঐ কনেকে অধিকার করে নেয়। উপকথায় মানবচরিত্রের কার্যকলাপ হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

উপকথায় নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যার বিশেষ গুরুত্ব থাকে। সাত, তেরো, কুড়ি ইত্যাদি সংখ্যাগুলো উপকথায় বার বার ঘুরেফিরে আসে। দিন, পশু-পাখির সংখ্যা কিংবা কোনো বস্তুর সংখ্যা গণনায় এগুলো ব্যবহৃত হয়। উপকথায় ক্ষুদ্র পশু-পাখিরাও উদার মনের অধিকারী হয়। অনেক উপকথায় দেখা যায়, রাজাদের ছোটপুত্র বিশেষ করে সাত রানির মধ্যে ছোট রানির পুত্র অথবা কন্যারা পশু-পাখি হয়ে জন্মায়। এরা রাজা কিংবা অন্যান্য ভাই কর্তৃক উপেক্ষিত এবং লাঞ্ছিত হলেও শেষ পর্যন্ত তারাই অন্যান্য ভাই এবং রাজাদের বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করে। এরা ক্ষুদ্র হলেও অসীম বুদ্ধির অধিকারী। উপকথায় যে পশুকে কেন্দ্র করে কাহিনী

Dhaka University Institutional Repository

আবর্তিত হয় সে পশু সাধারণত ধূর্ত প্রকৃতির হয়। এই ধূর্ততা শেষ পর্যন্ত তার জন্যে ভয়াবহ পরিণাম বয়ে আনে। অধিকাংশ উপকথায় দেখা যায়, এই ধূর্ত প্রকৃতির পশুদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয় না।

উপকথার উদ্ভব ও বিকাশ

উপকথার উৎপত্তি সম্পর্কে অনুসন্ধানে জানা যায়, আদিম মানুষ যখন পর্বতের গুহায় কিংবা অরণ্যে বাস করত তখন তারা পশুর সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য অনুভব করত না। যে বুদ্ধি বা মননশীলতা বা আচরণ মানুষকে পশু হতে পৃথক করে তা আদিম মানুষের মধ্যে ছিল না। পশুর মতো তারা কেবল জীবনধারণকে একমাত্র বৃত্তি বলে মনে করত। একটি উপজাতীয় লোককথায় শুনতে পাওয়া যায় 'In the begining of things, men were as animals and animals as men.' ভারতীয় উপমহাদেশের জনশ্রুতিতেও শোনা যায়, সত্যযুগে পশু-পাখি মানুষের মতো কথা বলতে পারত। পশু-পাখির চরিত্রমূলক উপকথাসমূহ সেই আদিম জীবনের সাংস্কৃতিক ভিত্তির ওপরই উদ্ভূত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়, যা আজও পর্যন্ত মানুষের মুখে মুখে চালু রয়েছে।

উপকথার জন্ম সম্পর্কে আরও বলা যায়, উদ্ভিদ অর্থাৎ প্রকৃতি থেকেই মানুষের জন্ম, প্রতিকূল প্রকৃতির মধ্যেই জীবন-সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজের বিকাশ ঘটেছে। মানুষ যেহেতু প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয় তাই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রয়েছে ঘনিষ্ঠ ও আত্মিক সম্পর্ক। আদিম মানুষ উপকারী ও বীভৎস প্রকৃতির প্রাণী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছিল। আর তাই চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বন-পাহাড়-নদী মানুষের ভাবনাকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। উন্নত জটিল মস্তিষ্ক, দুটি কুশলী হাত ও ভাষার অধিকারী সামাজিক গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃতির ওপর আংশিক আধিপত্য বিস্তার করলেও প্রাথমিক অবস্থায় অপরাজেয় প্রকৃতির হাতে তারা ছিল বড় অসহায়। প্রকৃতির ওপরে ছিল নির্ভরশীল। তাদের চিন্তাচেতনা, দৃষ্টি এবং মনন ছিল সীমাবদ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তাদের কিছুটা ধারণা জন্মালেও এই গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহৎ কিছু কল্পনা করা খুব সহজ ছিল না। সীমাহীন ভয় ও বিপুল বিস্ময় নিয়ে আদিম মানুষ চারপাশের প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা ভয়াবহতাকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে এবং এই ভয়াবহতার কারণ জানতে না পেরে বিহ্বল ও হতবাক হয়েছে। বন্যা তাদেরকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে বাধ্য করেছে, দাবানল করেছে বিধ্বস্ত, অসহনীয় শীত করেছে কম্পিত, গ্রীষ্মের মধ্যদুপুরের প্রখর রৌদ্র করেছে তাপিত এবং ঝড়-ঝঞ্ঝা বৃষ্টি করেছে উন্মূলিত। অনেক সময় জীবনধারণের প্রয়োজনে তারা পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে গড়িয়ে পড়া পাথরের আঘাতে আহত হয়েছে। তারা তাদের সীমিত বুদ্ধি ও অল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে এইসব উপদ্রবের কথা অনেক ভেবেছে, কিন্তু কোনো সমাধানে আসতে পারে নি। তাছাড়া ঐ সময়ের মানুষ অচেতন প্রাণহীন পৃথিবী ও তার জড়বস্তুরাজির কল্পনা করতে শেখে নি, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সূত্র আবিষ্কার করা তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাই সকল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও প্রচণ্ড বিরূপতার পেছনে অদৃশ্য পরাক্রমশালী কোনো শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করছে তারা। এইসব শক্তি তাদের কাছে নিরাকার নয়; নানা আকারবিশিষ্ট। মানুষ কোনোকালেই বিমূর্ত চৈতন্য চিন্তা করতে পারে না। প্রত্যক্ষ বস্তুকে কেন্দ্র করেই মানুষের বিভিন্ন চৈতন্যের জন্ম হয়। তাই আদিম কালের মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা বস্তুকে ঘিরেই আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে। আদিম মানুষের গণ্ডিবদ্ধ মন ভেবেছে যে, অদেখা শক্তি নিশ্চয়ই এইসব প্রতিকূলতা ঘটানোর জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আর তার প্রভাবেই এইসব ঘটনা ঘটছে। তারা আরও ভাবত যে, এই প্রতিকূলতা অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাদেরই কর্মফল। নিশ্চয়ই সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

কোনো গর্হিত কাজের জন্যেই প্রাকৃতিক শক্তি বা তার পেছনের কোনো দেবতা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাই তারা এইসব কষ্টদায়ক উৎপাত বন্ধ করার জন্যে দেবতাদের প্রতি আকুল আবেদন জানাত। তারা এও ভাবত যে, দেবতাদের তুষ্ট করতে না পারলে সেই অদৃশ্য শক্তি তাদের মঙ্গল করবে না। মানুষ ও পশুর রক্ত ঝরিয়ে তারা অসন্তুষ্ট শক্তির কাছে ভিক্ষা চাইত। এই ভীতি ও সরল বিশ্বাস থেকেই, পর্যুদস্ত জীবন থেকেই আদিম মানুষের মনে একটি সহজ ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছে।

আদিমকালে মানুষ অদৃশ্য দেবতাদের পশু, বৃক্ষ বা পাহাড়ের আকৃতি কল্পনা করে পূজা করেছে। তারা কখনও দুর্যোগের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে কোনো শক্তিশালী পশু, কোনো বৃহৎ গাছ কিংবা কোনো দুরতিক্রম্য পাহাড়কে। এর পেছনে যথেষ্ট কারণও রয়েছে। আদিম সহজ-সরল মানুষ বন-জঙ্গল, পশু-পাখি, গিরি-গুহাকে ঘিরেই ঘর বেঁধেছে এবং তাদের নিত্যকর্ম ছিল তাদেরকে নিয়েই। আদিম সমাজের সাহিত্য, শিল্পও গড়ে উঠেছে এসবকে ঘিরেই। ফলে পশু-পাখিকে নিয়ে আদিম সমাজের মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

উপকথার মধ্যে মুখ্য স্থান জুড়ে আছে পশু-পাখি। কৌতুকরস মিশ্রিত আবার কখনও বেদনাসিক্ত অনেক উপকথা গড়ে উঠেছে নানা জাতের পরিচিত পশু-পাখিকে ঘিরে। মানুষ পশু-পাখিকে নায়ক-নায়িকায় প্রতিষ্ঠিত করে অনেক গল্প বেঁধেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে পশু-পাখি নিয়ে এত গল্প লেখার কারণ কী? এর উত্তর পেতে গেলেও মানুষের আদিম সমাজ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি বর্তমান কালকেও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। সামাজিক ,অর্থনৈতিক, ধর্মীয় জীবনে পশু-পাখির প্রভাব অতি সাধারণ জীবের স্তর থেকে কেমন করে উন্নীত হয়েছে অন্য কোনো স্তরে, মানুষ এদের কী মর্যাদা দান করে এসেছে, এদের কাল্পনিক কথাবার্তা, চালচলন, ভাবভঙ্গি, আচার-আচরণ সব মানবিক চরিত্রকে কীভাবে আলোকিত করেছে, পশু-পাখির এই সর্বব্যাপী প্রভাবের কথা অনুসন্ধান করলেই বোঝা যায় কেন পৃথিবীর সব অঞ্চলে অসংখ্য বিচিত্র পশুকথা তথা উপকথার উদ্ভব ঘটেছে।

উপকথা শুধু মনের বিলাস বা অবসর যাপনে মনোরঞ্জনের জন্যে সৃষ্টি হয় নি। উপকথা আদিম মানুষের জীবনধারণ ও চিন্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সামাজিক আচরণ, ব্যথা-বেদনা, শোষণ-নিপীড়ন, রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অবুঝ মনের সংস্কার উপকথায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসেছে। যে মুহূর্তে আদিম মানুষ নিজের ও চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হলো, চোখ মেলে সবুজ বন্য প্রকৃতি ও সুনীল আকাশকে দেখার আংশিক অবকাশ পেল এবং পৃথিবীর বুকে নিজেদের অসহায় উপস্থিতি উপলব্ধি করল সেই দিন থেকে সে মুক্তমনে পশু-পাখি ও গাছের সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করে নিয়েছে এবং সগর্বে ঘোষণা করেছে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনের ওপর তাদের গভীর ও ব্যাপক প্রভাবের কথা। আদিম মানুষের এসব মনোভাবের প্রকাশই হলো উপকথা। এই অপরিহার্য ও অবিচ্ছিন্ন প্রভাব থাকার ফলেই পশু-পাখি তাদের কাছে আকৃতিতে ভিন্ন হলেও প্রকৃতিতে অভিন্ন ও আচরণে মানবিক। মানুষ দেখেছে পশুর সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, নিবিড় বোধশক্তি, অসীম দৈহিক শক্তি এবং সর্বোপরি তাদের অপরিমেয় চতুরতা। গোষ্ঠীমানুষ তাদের কাছ থেকে সাহস ও চতুরতার শিক্ষা নিয়েছে, শিকার-নৃত্যের সময় ও উল্লাস প্রকাশের মুহূর্তে পশুর ঢংকে অনুসরণ করেছে, কখনও পশুকে ভয়ও পেয়েছে। আবার পশুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে, পুজো করেছে, দেবতার সর্বোচ্চ আসনে বসিয়েছে, বিপদের পূর্বাভাস জেনে নিয়েছে পশুর আচরণের মাধ্যমেই। জীবন ও মৃত উভয় অবস্থার পশুই এইভাবে মানুষের চলমান জীবনকে প্রভাবিত করেছে, চালনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছে, উদ্দীপিত করেছে। তাদের সৃজনশীল মৌখিক ধারার গল্পে পশু-পাখি স্থান করে নিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই।

আজকের অগ্রসর মানুষের কাছে আদিম মানুষের পশু পূজা বিষয়টি অদ্ভুত লাগতে পারে; কিন্তু বর্তমান কালের মানুষের মধ্যেও যে এর প্রভাব রয়েছে তা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেই স্পষ্ট হয়। আদিমকালে পশু কখনও অবিকৃত আকারে আবার কখনও রং-ঢং চড়িয়ে পূজিত হতো। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন পশুপূজার প্রচলন ছিল। যে এলাকায় যে পশু পাওয়া যায় না সেই পশুর কোনো ধারণা না থাকার ফলেই সেরকম পশু পূজিত হতো না কিংবা তাকে নিয়ে উপকথাও গড়ে ওঠে নি। সিংহ, ভালুক, হাতি, নেকড়ে বেড়াল, নেউল সাপ, সোনালি পাখি, তোতাপাখি, ঈগল পশুদেবতার স্তরে উঠেছে। বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পার্বণে এদের দেবতারূপে পূজা করা হয়। আবার, মিশরীয়, সুমেরীয়, গ্রীক এবং ভারতবর্ষীয় সভ্যতায় অনেক দেবতাই অর্ধেক পশু অর্ধেক মানুষ। আজও বিভিন্ন দেশে পশুকে পূজা দেয়া হয়। হিন্দুরা গরুকে দেবতা মনে করে এবং গরুর পায়ে জল ঢেলে; খুরে, কপালে, শিঙে সিঁদুর পরিয়ে তাকে বরণ করে নেয়। হাতি ও গরুর দেহ স্পর্শ করে অনেকেই প্রণাম করে।

আদিম মানুষ তাদের গোষ্ঠীর কৌমগুলির পরিচয় দিয়েছে পশু বা গাছের নামে। এ হলো তাদের টোটেম বিশ্বাস। পশু বা গাছকে কতটা গুরুত্ব দিলে তবেই তাদের নামে নিজেদের পরিচয় দেয়া যায় তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, সমাজের সকলেই এক আদি পিতা ও আদি মাতার সন্তান। তারা অধিকাংশ সময়েই পশু বা গাছের নামেই গোটা উত্তর পুরুষের নামকরণ করেছে। গোত্রদেবতাও স্থির হয়েছে পশু বা গাছের নাম থেকেই। যেমন– শাণ্ডিল্য বেলগাছ, কাশ্যপ কচ্ছপ, মৃগ মৎস্য বিশেষ, ভরদ্বাজ ভরত বা ভারুই পাখি, অত্রি, অগ্নি প্রভৃতি। লুইস হেনরি মর্গান এই সব গোত্র বা টোটেমের পৃথিবীজোড়া অসংখ্য উদাহরণ দিয়েছেন।

আদিমকালে মানুষের রোগেরও কোনো অন্ত ছিল না। এই রোগ নিরাময়ের জন্যেও পশু-পাখির ওপর নির্ভর করত তারা। তখনও বিভিন্ন গাছ-গাছালির গুণাগুণ সম্পর্কে মানুষ তেমন অবহিত ছিল না, দৈবের ওপরে আস্থা রেখেও তাই তাদের অদেখা শক্তির প্রতিনিধির ওপরে বেশি নির্ভর করতে হয়েছে। এরা বিশ্বাস করত কতগুলো পশুর রোগ নিবারণের অত্যাশ্চর্য ও অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। এই ব্যাপারে তারা সাধারণত শিকারী পশুকে নির্বাচন করত। অবশ্য অন্যপশুও একেবারে বাদ যায় নি। প্রায় প্রতি আদিম সমাজেই ভালুক, সিংহ, ঈগল, বাদুড় এবং বড় ইঁদুর প্রভৃতি রোগ নিবারক বলে বিবেচিত হতো। এদের দেহের অংশবিশেষ ধারণ করলে বিশেষ বিশেষ রোগ সারবে বলে তাদের বিশ্বাস ছিল। সামাজিক অসহায়ত্বের কারণে ও চিকিৎসার সুযোগের অভাবে এসব বিশ্বাস আজও সক্রিয় রয়েছে। তুলসী পোকা মাদুলীতে ধারণ করে বাত সারাবার প্রচেষ্টা আজও বাংলাদেশের গ্রামে প্রচলিত। ভালুক খেলা যারা দেখাতে আসে তাদের কাছ থেকে ভালুকের দেহের লোম কিনে শিশুদের কোমরে আজও বেঁধে দেয়া হয় রুগ্নশিশু স্বাস্থ্যবান হবে বলে।

আদিম সমাজে পশু ছিল মানুষের পরিচালক ও অভিভাবক। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কুকুর ছিল অরণ্যচারী মানুষের পথ নির্দেশক, দুর্গম এলাকায় যাওয়ার সময় আজও অনেক আদি গোষ্ঠী পশুর দেহের কোনো হাড় কিংবা পশুর প্রতিমূর্তি সঙ্গে রাখে। এগুলো অলক্ষ্যে তাদের পথ দেখাবে বলে বিশ্বাস করে। মৃত্যুর পরেও পশু

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে পথ দেখিয়ে স্বর্গে নিয়ে যায় বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করে। পশুকে কখনও ধাত্রী বা মানুষের জন্মদায়িনী মনে করা হয়। পশু যখন ধাত্রীরূপে গণ্য হয় তখন কিন্তু পালিত সন্তানদের প্রতি তার কোনো পাশবিক মনোভাব থাকে না। তখন সে পুরোপুরি মানবিক আচরণ করে। এরা যাদের মানুষ করে তোলে তারা সাধারণত যমজ হয়। রোমের চিরকুমারী সিলভিয়ার যমজ সন্তান রেমুস ও রোমুলাসের কাহিনী অতি পরিচিত। ভারতীয় পুরাণে দেখা যায়, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্মদায়িনী হলো একটি পশু। উর্বশীকে দেখে পিতা বিভাণ্ডক যৌন উত্তেজনা অনুভব করেন, ফলে তার বীর্যস্খলন ঘটে। এক হরিণী জলের সঙ্গে তা পান করে গর্ভবর্তী হয় এবং হরিণীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্ম হয়। এইসব ধাত্রী বা মায়েরা সাধারণত হরিণ, নেকড়ে, গরু, ছাগল, ঘোড়া প্রভৃতি স্তন্যপায়ী পশু হয়ে থাকে। ই বি টেইলরের 'দ্য অরিজিন্স অব কালচার' গ্রন্থে এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

আদিম মানুষের বিশ্বাস তারা আগুন পেয়েছে পশু কিংবা পাখির কাছ থেকে। উত্তর আমেরিকার রবিন পাখির আগুন আনার গল্প তো এই ধরনেরই এক গল্প।

মানুষের বিশ্বাস, তার সমস্ত গল্পের ভাণ্ডার সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে পশুর কাছে। দুটি আত্মার অস্তিত্বের ধারণা বহু প্রাচীন। মানুষের দ্বিতীয় আত্মার বাহন হয় সাধারণত পশু। বাংলা উপকথায় প্রাণ ভোমরার মধ্যে আত্মা লুকিয়ে রাখার কাহিনী খুবই পরিচিত।

মানুষ প্রথম যেদিন চিত্র অংকন করেছে সেদিন পশুরই চিত্র অংকন করেছে। গুহামানবের সেইসব চিত্র ছিল হোয়াইট ম্যাজিক। তারা বিশ্বাস করত, পশুর চিত্র অংকন করে তার সামনে শিকার নৃত্য করলে সহজে পশু-শিকার করা যায়। মানবসভ্যতা যখন কিছুটা অগ্রসর হয় তখন পরিচিত পশুদের কেন্দ্র করে রাশিচক্রের উদ্ভাবন ঘটে। যেমন– বৃষ, মেষ, সিংহ, বৃশ্চিক, কর্কট, মীন এবং মকর রাশিগুলি পশুকে কেন্দ্র করেই উদ্ভূত।

পশু-পাখির এই যে সার্বিক প্রভাব; এর ফলে কর্মে, চিন্তায়, আচারে কোনোসময়েই মানুষ পশুর প্রাধান্যকে অস্বীকার করতে পারে নি। তাই মানুষ যখন গল্প বলতে বসত, তখন অবচেতনভাবেই গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে পশু-পাখি চলে আসত। মৌখিক সংস্কৃতিতে আদিম মানুষ রসসিক্ত গল্প প্রকাশ করেছে পশু-পাখির মাধ্যমেই। সমাজ ও পরিবেশ সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়া এই চিরন্তন কথাটি উপকথা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

উপকথার বৈচিত্র্য

উপকথায় বিভিন্ন পশু-পাখির সমাবেশ ঘটার কারণে উপকথাকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়। বিখ্যাত লোককথা সংগ্রাহক আন্টি আর্নে এবং স্টিথ থম্পসন লোককথার যে টাইপ ইনডেকস তৈরি করেছেন তাতে উপকথা বিভাগটিকে ২৯৯টি সংখ্যায় ভাগ করেছেন। তিনি উপকথার মূলভাগ করেছেন সাতটি, *[দিব্যজ্যোতি মজুমদার ১৯৯৩: ৮৩-৮৫]* যেমন–

১-৯৯	বন্য পশু
১০০-১৪৯	বন্য পশু ও গৃহপালিত পশু
১০০-১৯৯	মানুষ ও বন্য পশু

Dhaka University Institutional Repository

২০০-২১৯	গৃহপালিত পশু
২২০-২৪৯	পাখি
২৫০-২৭৪	মাছ
২৭৫-২৯৯	অন্যান্য জন্তু ও বস্তু।

এই সাতটি মূলভাগের মধ্যে বাংলা উপকথার কয়েকটি অতিপরিচিত টাইপ ইনডেকসের সংখ্যাসহ তালিকা হলো–

১. বন্য পশু

১.	মাছ চুরি
৫	পা কামড়ে ধরা
৬	হাওয়ার গতি জিজ্ঞেস করা
৭	তিনটি গাছের নাম বলা
৯খ	ফসল ভাগের সময় শেয়াল নেয় ধান গাছের আগা ও ভালুক নেয় গোড়ার অংশ
২০ গ	পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এ ভয়ে পশুরা পালায়
৩০	শেয়াল নেকড়েকে বোকা বানিয়ে গর্তে নিয়ে আসে ও নিজে রক্ষা পায়।
৩৪	নেকড়ে বা বুনো কুকুর জলে হাড়ের ছায়া দেখে জলে ঝাঁপ দেয়
৪৯	ভালুক ও মধু
৫০	অসুস্থ সিংহ
৫১	সিংহের অংশ
৫৫	পশুরা রাস্তা তৈরি করে
৬০	শেয়াল ও সারস উভয়ে উভয়কে নিমন্ত্রণ করে
৬১	শেয়াল মোরগকে চোখ বুঁজে ডাকতে প্ররোচিত করে
৭৫	দুর্বলকে সাহায্য করা
৭৬	নেকড়ে ও সারস
৭৭	হরিণ ঝরনার জলে তার শিং দেখে মুগ্ধ হয়
৯০	ছুঁচ, লাঠি ও খরগোশ

২. বন্যপশু ও গৃহপালিত পশু

১০০	কুকুরের অতিথি হলে নেকড়ে গান গায়
১০৫	বেড়ালের একমাত্র কৌশল
১১০	বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে
১১৫	শেয়ালের বৃষাঙ প্রত্যাশা

Dhaka University Institutional Repository

১২২ খ খাওয়ার আগে ইঁদুর বেড়ালকে তার মুখ ধুতে প্ররোচিত করল

১২৩ তিন ভেড়া বন্য পশু

৩. মানুষ ও বন্য পশু

১৫০ শেয়ালের উপদেশ

১৫৫ অকৃতজ্ঞ সাপ আবার খাচায় বন্দী

১৫৭ মানুষকে ভয় পেতে শেখা

১৬০ কৃতজ্ঞ পশু, অকৃতজ্ঞ মানুষ

৪ গৃহপালিত পশু

২০১ অভুক্ত কুকুর প্রচুর খাদ্যের চেয়ে স্বাধীনতা পছন্দ করে

২১০ যাত্রাপথে মোরগ মুরগী ছুঁচ ও খিল

৫. পাখি

২২০ পাখিদের সভা

২২১ পাখিদের রাজা নির্বাচন

২২৪ ময়ূর পুচ্ছধারী কাক

২৪৫ পোষা পাখি ও বুনোপাখি

২৪৬ শিকারী ধনুক নোয়ায়

২৪৭ যে যার সন্তানকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে

২৪৮ কুকুর ও চড়াই

৬. মাছ

২৫৩ জলের মাছ

অন্যান্য জন্তু ও বস্তু

২৮০ পিঁপড়ে অনেক বোঝা বয়ে নিয়ে যায়

২৮১ বোলতা ও ঘোড়া

২৮৫ শিশু ও সাপ

বাংলা উপকথার অতিপ্রচলিত কয়েকটি মোটিফ সূচি হলো- *[দিব্যজ্যোতি মজুমদার ১৯৯৩; ২০৫-২০৭]*

বি ৪১.২ পক্ষিরাজ ঘোড়া

Dhaka University Institutional Repository

বি ১০২.৪	সোনালি মাছ
বি ১২২.০৪	ভবিষ্যৎ বলা শুকপাখি
বি ১৪৩	জ্ঞানী পাখি
বি ১৭৬.১	যাদু সাপ
বি ১৮৪.১	যাদু ঘোড়া
বি ২১১.১.৫	কথাবলা গরু
বি ১১১.২.১০	কথাবলা বানর
বি ২১১.৩.৪	কথাবলা শুকপাখি
বি ২১৫.১	পাখির ভাষা
বি ২৪০.৪	পশুরাজ সিংহ
বি ২৪৫.১	ব্যাঙদের রাজা
বি ২৯১.৪২	সর্পদূত
বি ৪০১	উপকারী ঘোড়া
বি ৪১১	উপকারী গরু
বি ৪২১	উপকারী কুকুর
বি ৪৩১.৩	উপকারী বাঘ
বি ৪৩৫.৪	উপকারী ভালুক
বি ৪৪১.১	উপকারী বানর
বি ৪৫০	উপকারী পাখি
বি ৪৫১.৪	উপকারী কাক
বি ৪৩৬.২	উপকারী বক
বি ৪৬৯.২	উপকারী হাঁস
বি ৪৭০	উপকারী মাছ
বি ৪৯১.১	উপকারী সাপ
বি ৫০৫	পশুর কাছ থেকে যাদুদণ্ড লাভ
বি ৫১৫	পশুর দ্বারা পুনর্জীবন লাভ
বি ৫৩৫	পশুধাত্রী
বি ৫৪২.২	পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে উদ্ধার লাভ
বি ৫৫২	পাখিবাহিত মানুষ
বি ৫৫৭.৭	বিড়ালবাহিত মানুষ
বি ৫৫৭.১২	ময়ূরবাহিত মানুষ
বি ৬৬২.১	পশু মানুষকে গুপ্তধনের সন্ধান দেয়
বি ৫৭১	মানুষের জন্য পশু কাজ করে
বি ৫৭৯.১	পথযাত্রায় পশু মানুষের সঙ্গী হয়

Dhaka University Institutional Repository

বি ৫৮১	পশু মানুষকে সম্পদ এনে দেয়
বি ৭৭৬.৬	বিষধর সাপ
বি ৮১১.৩	পবিত্রপশু গরু
বি ৮৭৫.১	মহানাগ

ভারতীয় প্রাচীনতম কথাসাহিত্য সংগ্রহের কাল থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত এদেশের লোকসাহিত্য পশু-পাখির চরিত্রমূলক রচনায় বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে আসছে। সেইজন্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেছেন একমাত্র ঈশপের উপকথা ব্যতীত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের যে উপকথায় পশু-পাখি চরিত্রের সাক্ষাৎ লাভ করা যায় তা ভারতীয় লোকসাহিত্যের দান। অতি আধুনিককালে কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই বিষয়ে ভারতবর্ষের পার্শ্বে আফ্রিকার জন্যেও একটু স্থান দাবি করার পক্ষপাতী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবাসীর এই বিষয়ক মৌলিক অবদানের কথা সকলেই স্বীকার করে থাকেন।

বাংলার উপকথায় যে সকল পশু-পাখির চরিত্র স্থান পেয়েছে, তাদের মধ্যে শিয়ালই প্রধান। এই বিষয়ে উপজাতীয় সাঁওতাল প্রতিবেশীর উপকথার সঙ্গে এর অপূর্ব ঐক্য দেখা যায়। সাঁওতাল ও বাঙালি উভয় জাতিরই উপকথায় শিয়ালই প্রধান চরিত্র। ইউরোপীয় উপকথায় খেঁকশিয়ালীর যে স্থান, বাংলা ও সাঁওতাল জাতির উপকথায় শিয়ালেরও সে স্থান। এই শিয়াল চরিত্রটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে *[অন্তরা মিত্র ২০০৪: ৪৯]*—

> The Jackal is not throughout described and characterized in a uniform way. Usually he is a clever and dextorous animal. Which is always prepared to assist those who have suffered wrong in asserting their right. In some tales, however, he acts in a different way. He is malicious and treacherous, but usually he is defeated in the end, just like the foolish devil in European folklore.

বাংলা উপকথায় শিয়ালের এই প্রাধান্য সম্পর্কে উপরি-উক্ত বিশেষজ্ঞ অনুমান করেছেন যে, এর মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র জাতির সাংস্কৃতিক উপাদান এসে একত্রে মিশেছে। একটি হলো কোল মুণ্ডা জাতির (সাঁওতাল-এর একটি শাখা) ও অপরটি আর্য ভাষাভাষী জাতির। তিনি অনুমান করেন, কোল-মুণ্ডা জাতির মধ্যেই শিয়াল সম্পর্কিত কাহিনীর সর্বপ্রথম উদ্ভব হয়েছিল। তাদের নিকট থেকেই আর্যভাষীগণ এসব গ্রহণ করে। কিন্তু আর্যভাষীগণ তাদের নিজস্ব সমাজের কতগুলো নীতি ও ধর্মকথা এদের মধ্য দিয়ে প্রচার করার জন্যে এই কাহিনীগুলোকে উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন করে নিয়েছে। এর ফলেই শিয়াল পরোপকারী বলে কল্পিত হয়েছিল। আর্য ও অনার্য উপাদান নিয়ে আর্যভাষীগণই সমগ্র পশু জগতের একটি নতুন পরিকল্পনা করেন, তাতে সিংহ রাজা ও কোল-মুণ্ডাজাতি পরিকল্পিত পশুসমাজের সর্বপ্রধান চরিত্র শিয়াল মন্ত্রী পদে

Dhaka University Institutional Repository

অভিষিক্ত হয়। শিয়ালের এই মন্ত্রিত্বের পদ হতেই তাকে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলে কল্পনা করা হয়। তখন থেকে দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে সিংহ ও মানসিক বুদ্ধির দিক দিয়ে শিয়াল পশুসমাজের ওপর আধিপত্য স্থাপনকারী বলে বিবেচিত হয়। শিয়াল সম্পর্কিত এই মিশ্র পরিকল্পনা কালক্রমে পুনরায় কোল-মুন্ডা সমাজেও প্রবেশ করেছে।

বাংলা উপকথায় পশু-পাখির চরিত্রের মধ্যে শিয়ালের পর আর যে কয়টি পশু-পাখির উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলো হলো বাঘ, কাক, চড়ুই ও টুনটুনি। একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, যদিও বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনে গরু, কুকুর ও বিড়ালের মতো পরিচিত জীব আর নেই, তবুও তাদের সম্পর্কিত উপকথার সন্ধান পাওয়া বিরল। অথচ কুকুর কিংবা বিড়ালের বুদ্ধি সম্পর্কিত বিশ্বাস এদের সমাজে অপ্রচলিত থাকার তেমন কোনোও কারণ নেই। কুকুর অপবিত্র জিনিস খায় করে থাকে বলে এর সম্পর্কে কোনো কাহিনী এদেশে প্রচার লাভ করতে না পারলেও বিড়াল সম্পর্কে একথা বলা যায় না। আসলে এর কারণ সুগভীর মনস্তত্ত্বমূলক, জাতিতত্ত্বমূলক নয়। যদিও সংস্কৃত উপকথায় কচ্ছপের স্থান আছে কিন্তু বাংলা উপকথায় নেই। তারপর মোরগ এবং শুকরের কথাও এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়। শুকর হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের কাছে অপবিত্র তাই বাংলা উপকথায় এদের প্রভাব না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু মোরগ বাংলা উপকথায় না থাকা একটু বিস্ময়কর।

বাংলাদেশে পৃথিবীর হিংস্রতম বাঘের অবস্থান হলেও এদের হিংস্রতা কোনো উপকথায় প্রকাশ পায় নি। পশু-পাখি সম্পর্কিত উপকথাসমূহ অধিকাংশই হাস্যরসাত্মক বলে এদের ভয়ংকর রূপ বর্জন করেই এদেরকে উপকথার মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। সেইজন্যেই বাংলা উপকথায় এরা হাস্যস্পদ, বাংলা উপকথায় বাঘ নির্বোধই শুধু নয়, ভীরুও বটে।

উপকথা যে হাস্যরসাত্মক ছেলেভুলানো গল্প নয় কিংবা সংস্কারবদ্ধ আদিম মনের আচ্ছন্ন আত্মপ্রকাশ নয়, এমন চিন্তার অবসান দীর্ঘকাল আগেই পাশ্চাত্য দেশের বিদ্বান সমাজে ঘটেছে। আমাদের দেশেও শরৎচন্দ্র মিত্র, দীনেশচন্দ্র সেন, ভেরিয়ে এলউইন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রমুখ লোকতত্ত্ববিদরা এই দিকে নতুন দিশা দেখিয়েছেন। লোকসংস্কৃতির চর্চায় এখন যাঁরা নিজেদেরকে নিবেদিত করছেন তাঁরা ঐ পথে আরও অগ্রসর হতে চেয়ে যদি বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিগুলোকে অবলম্বন করে উপকথা বিশ্লেষণের দিগ্বলয়কে উদ্ভাসিত করতে পারেন, তাহলে সম্ভবত একটি সুমহৎ সাংস্কৃতিক দায়িত্বই পালন করা হবে। কেননা উপকথা আদিমকাল থেকে শুরু করে আজও সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ পাঠকমনের আনন্দ দানে সক্ষম।

Dhaka University Institutional Repository

মিথ-এর প্রধান ধারাসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

Myth লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। Myth বা পুরাণের মধ্যে মানব মনের রহস্যঘন রূপটির সন্ধান সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। যে জনগোষ্ঠী যত প্রাচীন ও পুরনো মূল্যবোধকে ধারণ করেছে, তাদের মধ্যে আদিম পুরাকাহিনী বা লোকপুরাণের প্রভাব তত বেশি। পৃথিবীর প্রাচীনতম যে পাঁচটি মহাকাব্য রয়েছে গিলগামেশ, রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ও ওডিসি — এগুলোর উৎস মূলত লোকপুরাণ থেকেই। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ঐতিহ্যমন্ডিত জনগোষ্ঠীতেই লোকপুরাণের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে পন্ডিতরা মনে করেন যে, ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম, মিশর, মেসোপটেমিয়া, ব্যবিলন, পলিনেশীয়-মেলানেশীয়-মাইক্রোনেশীয়, বিসায়া, উলিথি, ছামারো, তাবুতেইউ, কেরাকি বিলিবিলি, দোবু, কারোঙগোয় প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠী এবং আফ্রিকা মহাদেশের লুবা (কংগো), মাসাই (কেনিয়া), ক্রাচি (ঘানা), ইকোই (নাইজেরিয়া), মেন্ডে (সিয়েরালিওন ফ্যাঙগোবোন), বাফুন (ক্যামেরুন) আদিবাসী গোষ্ঠীর লোকপুরাণের ঐশ্বর্যভান্ডার বিস্ময়কর। পুরাণের ইংরেজি প্রতিশব্দ মিথ। ইউরোপীয় মিথ এবং আমাদের পুরাণ যদিও হুবহু সমার্থবোধক নয়, তবু ব্যবহারিক প্রয়োজনে সাধারণভাবে এ দুটিকে পরস্পরের প্রতিশব্দ হিসেবেই ধরে নেয়া হয়। আমরা যাকে পুরাণ বলে চিহ্নিত করি, তার উপকরণগত বিস্তৃতি মিথের চেয়ে অনেক বেশি। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে যে কাহিনীগুলো পুরাণ বলে গণ্য হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় প্রতীতি, ইউরোপীয় অর্থের মিথ, কিংবদন্তি এবং বাস্তব ইতিহাসের একটি প্রত্নপ্রতিমা। ইতিহাসের উপকরণ মিথকে কাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করলেও মিথ ইতিহাস নয়। পুরাণও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। ইতিহাসের উপাদান ঐ দুয়ের মধ্যেই অনিবার্যভাবে লুকিয়ে থাকে। তাই ইতিহাস এবং পরিবর্তনশীল যুগচেতনার ছায়া মিথ এবং পুরাণের মধ্যে থেকে যায়।

পুরাণকে একবাক্যে সংজ্ঞায়িত করা কষ্টকর। মিথ শব্দের উৎসে রয়েছে গ্রিক 'Muthos' শব্দ যার অনুষঙ্গে বোঝা যায় যে, এই ব্যাপারটি বস্তুতপক্ষে ছিল মৌখিকভাবে প্রচলিত কাহিনী; যা আদিমকাল থেকে মানুষের সমাজে ক্রমবিবর্তিত রূপে প্রচলিত হয়ে আসছে। মিথের মধ্যে একটি জাতির সামগ্রিক অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় অর্থাৎ পুরাণের মধ্যে একটি জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যের পরিকাঠামোটি নিবিড়ভাবে মিশে থাকে। পরবর্তীকালে তার ওপরেই গড়ে ওঠে সাহিত্যের বহু বিচিত্র সৃষ্টিকর্ম। পুরাণের আদি রূপটির মধ্যে ধর্মাচার, দেবতাকল্পনা এবং বিচিত্র ধরনের সংস্কার পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থান করে। উত্তরকালে কবি-শিল্পীরা সেই উপকরণগুলোকে চয়ন অথবা বর্জন করে এবং নিজেদের সমসাময়িক জীবনধারা লব্ধ ফল যেসব ধ্যান-ধারণা তার সঙ্গে মিশ্রিত করেই নতুন নতুন কাহিনী সৃষ্টি করেন। পুরাণ মূলত ধর্মীয় অনুষঙ্গটিকে উত্তরকাল পর্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রাখে। মিথ তার বাইরের আবরণটা পাল্টাতে পাল্টাতে চলে এলেও, পুরাণের বহিরাঙ্গটি কিন্তু মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিতই থেকে যায়। তাই পুরাণ নিয়ে যখন পরবর্তী প্রজন্ম চর্চা করতে থাকে, তখন সেখানে সমান্তরাল দুটি মাত্রা উদঘাটিত হয়। একটির চালিকাশক্তি ভক্তি ও ধর্মবিশ্বাস, আর অন্যটি ধর্মীয় আবেগ থেকে মুক্ত হয়ে ইতিহাসের ইঙ্গিতকেই সূচিত করে অথবা ব্যক্তিমানসের অনুধ্যানে নিজের কালকে প্রতিবিম্বিত করে। লোকপুরাণের মধ্যে অসম্ভব, অবাস্তব কল্পনার আধিক্য থাকে, কিন্তু এর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে লোকসমাজের মানসিক প্রবণতার সূত্র আবিষ্কার করা যায়।

বিজ্ঞানীরা যেমনি বহু যত্নে বহু পরিশ্রমে মাটি, পাথর, গাছের শেকড়ের স্তরগুলো সরিয়ে জীবাশ্মের সন্ধান করেন তেমনি লোকপুরাণের বহিরাঙ্গ আপাত অবিশ্বাস্য অতিপ্রাকৃতিক অপার্থিব কাহিনীর আড়ালে যে সমাজ-

Dhaka University Institutional Repository

মনন ও বিশেষকালের রীতিনীতি লুকানো রয়েছে তাকে আবিষ্কার করাও বিজ্ঞাননির্ভর লোকসংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রধান কাজ।

পুরাণ-এর সংজ্ঞা

লোকপুরাণের সংজ্ঞা নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞরা নানা মত দিয়েছেন, অসংখ্য ব্যক্তি মিথের ব্যাখ্যা দিয়েছেন নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অধ্যাপক ওয়াচ (Wach) বলেছেন *[ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৯১: ৯]*—

> লোকপুরাণ ধর্মোপলব্ধির প্রথম মননশীল বিশ্লেষণ।

ওয়াচ তাঁর সংজ্ঞায় সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে সরাসরি কিছু না বললেও লোকপুরাণকে যে প্রথম বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন, তা একদিক দিয়ে যথার্থ হয়েছে বলেই স্বীকার করতে হয়। তবে এই বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা আদিম সমাজের মানুষের। এরা জগতের সৃষ্টিকে ধর্মোপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। ধর্মবোধ থেকেই লোকপুরাণের উদ্ভব। তবে সেই সঙ্গে স্বীকার করতে হয় প্রদত্ত সংজ্ঞায় লোকপুরাণের অপরাপর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখিত হয় নি অর্থাৎ লোকপুরাণের ভাষা, গল্পরস এগুলো সম্পর্কে স্রষ্টা অথবা সমাজের অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি, পাত্র-পাত্রী ইত্যাদি অনুল্লেখিত রয়ে গেছে।

উইলিয়াম ব্যাসকম (William Bascom) তাঁর *The Forms of Folklore* -এ বলেছেন *[ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৯১: ১০]*—

> Myths are Prose narrations which, in the society in which they are told, are considered to be truthful accounts what happened in the remote past.

উপরি-উক্ত সংজ্ঞায় লোকপুরাণের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, সেগুলো যে যথাযথ হয়েছে তা অনস্বীকার্য।

জোসেফ ফন্টেরোজ (Joseph Fontenrose) তাঁর *The Ritual Theory of Myth* গ্রন্থে লোকপুরাণের দীর্ঘ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, *[ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৯১: ১১]* —

> লোকপুরাণ হলো দৈত্য, দেবতা, অশরীরী আত্মা কিংবা অলৌকিক চরিত্রবান অতিমানবের ক্রিয়া-কাণ্ডের ঐতিহ্যবাহী কাহিনী।

লোকপুরাণ বলতে ফন্টেরোজ বিশেষ একশ্রেণির গল্পকে বুঝিয়েছেন যা মৌখিকভাবেই সৃষ্ট ও চলিত ছিল; এই গল্পের চরিত্রগুলো বিশেষ শ্রেণির এবং গল্পগুলো আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত। অর্থাৎ ফন্টেরোজ লোকপুরাণের গল্পরস, চরিত্র ও বিষয়কেই বিশেষভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। মিরচা এলিয়াদ (Mirca Eliade) তাঁর সুবিখ্যাত *Myth and Reality* গ্রন্থে মিথের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে *[ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৯১; ৯]* —

Dhaka University Institutional Repository

> Myth tell us how, through the deeds of supernatural beings a reality came into existence, be it the whole of reality, the cosmos or only a fragment of reality, an island, a species of planet, a particular kind of human behaviour, an institution. Myth then is always an account of a creation' it relates how something was produced, began to be.

ব্রনিস্লাভ মেলিনোভস্কি (Bronislav Malinowski) তাঁর *Myth in Primitive psychology'* গ্রন্থে লোকপুরাণকে মানবসভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন যে *[ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৯১: ১০]*—

> লোকপুরাণ নিছক অলস কাহিনীমাত্র নয়, এ এক শক্তি যা মোটেই মননশীল ব্যাখ্যামাত্র নয় কিংবা সুরুচিপূর্ণ কল্পনামাত্র নয়।

এগারটন সাইকস (Egerton sykes) তাঁর সংজ্ঞায় লোকপুরাণ বলতে আদিম মানুষের লোকস্মৃতিকে বুঝিয়েছেন, তাঁর মতে *[ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৯১: ১২]*, এই লোকস্মৃতিতে প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অলংকৃতভাবে ধরা পড়েছে। এগারটন এঁর সংজ্ঞায় লোকপুরাণের গুরুত্বের ওপরই সমধিক দৃষ্টিপাত করা হয়েছে; সেই সঙ্গে যে মানসিকতা এই সব বৃত্তান্ত সৃষ্টিতে সক্রিয় ছিল, সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

লুইস হার্বাট গ্রে (Louis Herbert Gray) এবং জর্জ ফুটমোর (George Footmoore) তাঁদের *The Mytholgy of all Races* গ্রন্থে বলেছেন, *[ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৯১; ১০]*

> ... Myths reveal man's first notions about their world and the powers at work in it, and the relation between men and those powers. They show what things in their surroundings early engaged mains attention what things seemed to them to need explanation; and how they explained them.'

কে. কে. রুথভেন (K. K. Ruthven) তাঁর *The Critical Idiom* গ্রন্থে সীমিত পরিসরে পুরাণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এর মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন *[ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৯১: ১২]*—

> ব্যুৎপত্তিতে লোকপুরাণ দুর্বোধ্য, আকৃতি বা রূপে এগুলো পরিবর্তনশীল এবং অর্থে অনিশ্চিতার্থক।

মারিয়া লিচ (Maria Leach) সম্পাদিত *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend* গ্রন্থে লোকপুরাণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, *[ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৯১; ১০]*

Dhaka University Institutional Repository

> It concerns the word, as it was in some past age before the present conditions were establised. It treats and origins, and therefore may be identical with creation and origin legends.

গ্রন্থটিতে পুরাণের সংজ্ঞায় আরও বলা হয়েছে–

> A story represented as having actually occured in a previous age explaining the cosmological as super natural tradition of a people, their gods heroes, cultural traditions, religion, belief.'

অর্থাৎ আদিম মানবের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, ধর্ম, দেবদেবীর সৃষ্টিরহস্য, নানা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক এই মিথ। মিথ বা পুরাণ সম্পর্কে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন স্টিথ থম্পসন। তিনি বলেন, 'পুরাণ হলো এমন কাহিনী যার মধ্যে বর্তমান বিশ্ব নয়, একটি অতীতের বিশ্বই বর্তমান।' তাঁর মতে, এসব কাহিনীতে দেবতা, আধা-ঐশ্বরিক নায়ক বা বীর এবং সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিপ্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়।

পুরাণ ঘনিষ্ঠভাবে লোকের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচারের সঙ্গে জড়িত। এগুলো কখনও 'বীরকাহিনী' এবং কখনও 'ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনীর' সঙ্গে জড়িত থাকে। তবে এসব কাহিনীকে শ্রেণিবদ্ধ করে তাকে ধর্মীয় তাৎপর্যে মন্ডিত করা হয়। পুরাণের বীর বা নায়ক কোনো না কোনোভাবে মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। মূল কাহিনীতে দেবতা বা আধাদেবতাদের অসংখ্যা অভিযাত্রার বর্ণনা থাকে। 'বীর কাহিনী', তাই 'পুরাণ কাহিনী' থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং আশরাফ সিদ্দিকী ইংরেজি myth কে যথাক্রমে 'লৌকিক পুরাণ' ও 'লোকপুরাণ' বলে অভিহিত করেছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন *[আবদুল হাফিজ ১৯৭৬: ১১]*—

> সৃষ্টির অজ্ঞাত লীলারহস্য বর্ণনা করিয়া যে সকল অলৌকিক বিবরণ রচিত হইয়া থাকে, ইংরেজিতে তাহাকে Myth বলা হয়, বাংলায় তাহাকে লৌকিক পুরাণ বলা যাইতে পারে।

আশরাফ সিদ্দিকী বলেন *[আবদুল হাফিজ ১৯৭৬: ১১]*—

> সত্যি সংঘটিত হয়েছিল এমন লোকবিশ্বাসপূর্ণ বংশানুক্রমে চলে আসা গল্পই হলো Myth।

ড. সিদ্দিকী পুরাণের সঙ্গে Myth-এর পার্থক্য সম্পর্কে বলেছেন, পুরাণের সঙ্গে Myth-এর ব্যবধান হলো এই যে, পুরাণে কোনো বিশিষ্ট দেবতা বা বিশিষ্ট মানুষের জীবন-কাহিনী বা লীলাবৈচিত্র্য বর্ণিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে পুরাণ বা লৌকিক পুরাণ আদৌ লোককাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কিনা সে বিষয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন। ভট্টাচার্যের সংজ্ঞায় শুধু সৃষ্টিরহস্যের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে সিদ্দিকীর সংজ্ঞায় লোকপুরাণের যুগসঞ্চিত ঐতিহ্যের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

পুরাণের সংজ্ঞা বিভিন্ন রকম হলেও স্টিথ থম্পসন পুরাণের যে আলোচনায় দিয়েছেন তা বৈজ্ঞানিক বলেই মনে হয়। উপরি-উক্ত আলোচনার আলোকে পুরাণের কতগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১. পুরাণে মানব মনের রহস্যঘন রূপের সন্ধান পাওয়া যায়।

২. লোকপুরাণের কাহিনীগুলোর মধ্যে অসম্ভব অবাস্তব কল্পনার আধিক্য রয়েছে।

৩. পুরাণের মধ্যে একটি জাতির সামগ্রিক অস্তিত্বের পরিচয় থাকে।

৪. পুরাণে ধর্মীয় ভক্তিবিশ্বাস প্রকাশিত হয়।

৫. পুরাণ এক অর্থে একটি জনগোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রামের সমস্যাবলির কাল্পনিক সমাধান।

৬. পুরাণ ঘনিষ্ঠভাবে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচারের সঙ্গে জড়িত।

৭. পুরাণে দৈত্য, দেবতা, অশরীরী আত্মা প্রভৃতি অলৌকিক কাহিনী থাকে।

৮. পুরাণে দেবতা, আধা-ঐশ্বরিক নায়ক বা বীর এবং সমস্ত বস্তুর সৃষ্টির প্রসঙ্গ থাকে।

৯. পুরাণের কাহিনীতে দেবতা বা আধাদেবতাদের অসংখ্য অভিযাত্রার বর্ণনা থাকে।

১০. পুরাণে আদিম সমাজজীবন এবং সেই সমাজজীবনের প্রচলিত রীতি-নীতি, বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়।

১১. শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করা পুরাণের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৩. পুরাণ মানবজাতির শৈশবাবস্থার জিজ্ঞাসার এক প্রতিচ্ছবি।

১৪. পুরাণ লোকায়ত সমাজনীতির ধারক।

পুরাণের উদ্ভব

পুরাণ কী করে গড়ে উঠেছে— সে সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা নানা ধরনের অভিমত প্রকাশ করলেও একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে, আদিম মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির অনেক দুর্বোধ্য বিষয় এবং ঘটনার অন্তরালে নানা ধরনের অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করত। এইসব শক্তির বিবর্তিত রূপই হলো দেবতা, যাঁদের ক্রোধ নিরসন এবং মনস্তুতির জন্যে বিভিন্ন ধরনের আচারবিধি পালন করা হতো। এরই সূত্রে যেসব গল্প কালক্রমে গড়ে উঠেছে, তা-ই রূপান্তরিত হয়েছে পুরাণে। এই ধরনের আদিম ঘটনাগুলো সম্বন্ধে প্রচলিত ভাবনাসমূহ ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে এবং তার ওপরে মানুষের চলমান সমাজধারার প্রবাহ যে পলিসঞ্চিত করে গেছে, সেইগুলোই একটা সামগ্রিক পুরাণ-ভাবনায় পরিণত হয়েছে। এই ব্যাপারটি পৃথিবীর সমস্ত জাতি এবং তাদের সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতেই ঘটেছে। জোসেফ ফন্টেরোজ 'দ্য রিচুয়াল থিওরি অব মিথ' (১৯৭১), কে. কে রুথভেন 'দ্য ক্রিটিক্যাল ইডিয়ম মিথ' (১৯৭৬), লেভিস্ত্রস 'স্ট্রাকচারাল অ্যানথ্রোপোলজি' (১ম খণ্ড, ১৯৭৭) প্রভৃতি বইতে তা যথাযথভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। আদিম ভাবনার ওপর পরবর্তীকালের সামাজিক মূল্যবোধগুলো আরোপিত হতে হতে যে কাহিনীমালা গ্রন্থিত হয়ে উঠে, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মিথ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

তারাই রূপান্তরিত হয়েছে সামগ্রিক মিথোলজিতে। ঠিক এইভাবেই পৃথিবীর সমৃদ্ধ পুরাণসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে বিভিন্ন দেশে।

মানুষের ইতিহাসেও ব্যবহারিক সংস্কৃতির যে ক্রমবিবর্তন ঘটেছে, সেই সমস্ত উপলক্ষগুলোকে গল্পের আকারে একেকটি জাতি নিজের মতো করে সঞ্চিত করে রেখেছে তাদের ঐতিহ্যের পরম্পরার মধ্যে। এগুলো তাদের মধ্যে এমনভাবেই প্রভাব বিস্তার করে যে, তা মনের গভীরে স্থায়ীভাবেই অবস্থান করে। যেমন- আগুন জ্বালাতে শেখা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিরাট প্রভাব সৃষ্টিকারী ঘটনা। পৃথিবীতে সমস্ত সংস্কৃতিতেই সেই অগ্নির ওপর অধিকার নিতে অসংখ্য কাহিনী তৈরি হয়েছে। সেই অধিকার আয়ত্ত করতে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বারবার যে দ্বন্দ্ব ঘটেছে, তারই কাহিনী অগ্নিচয়নের পুরাণগুলোতে বিবৃত আছে। সেই সমস্ত পুরাণ– যেসব ক্ষেত্রে বৃত্তের মিথোলজি অন্তর্গত হয়েছে তখনই তার মধ্যে প্রমিথিউস কথার মতো ধ্রুপদী পুরাণবৃত্ত তৈরি হয়েছে।

আমাদের সংস্কৃতিতেও এইরকম উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়, হরধনু ভেঙে রামচন্দ্রের সীতাকে অর্জন করা কিংবা তারই পদস্পর্শে অভিশপ্ত অহল্যার প্রাণ ফিরে পাওয়ার ধ্রুপদী কাহিনীর গভীরে যে ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে তা যথাক্রমে শিকারজীবী অর্থনীতি থেকে (হরধনু যার প্রতীক) কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় (সীতা অর্থাৎ লাঙলের ফলা যার প্রতীক) উত্তরণের এবং অকর্ষিত জমির (অহল্যাভূমি) কৃষির মাধ্যমে শস্য-শ্যামলা হয়ে ওঠার গল্প চিহ্নিত হতে পারে।

লোকপুরাণে আদিম যুগের কিছু কিছু স্মৃতি বাহিত হলেও ঠিক কোন সময়ে তা রচিত হয়েছিল তা নিয়ে কিছু বলা দুঃসাধ্য । মনে রাখা দরকার, পুরাণ প্রথমাবধিই লিখিতরূপে আবদ্ধ হয় নি। অনেকে পুরাণকে সত্য বলে মানতেই রাজি নন। ফন্টেরোজ-এর মতে, *[ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৯১; ১৩]*

> Myths as well as rituas, may have their origins in dreams and visions.

উইলিয়াম ব্যাসকম তাঁর *'The Forms of Folklore'*-এ পুরাণের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন *[ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৯১: ১৩]*—

> This hypothesis about the origin and early development of story telling does not mean that all myths have an origin in actual events of the dim past, or that every single myth must be traced back to some persons tale of an actual event. I do not mean that mythological persons were one real persons; they may be wholly imaginary in their inception.

ফন্টেরোজ-এর মতে, পুরাণ আচার রীতি-নীতির উৎস— স্বপ্ন বলে উল্লেখিত হয়েছে। ফ্রয়েড স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে স্বপ্নকে অতৃপ্ত ইচ্ছা বা যে বাঞ্ছিত চরিত্র অথবা ঘটনার বাস্তবে সান্নিধ্যলাভ অসম্ভব – তারই লাভের উপায় বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব মিথের উৎপত্তিস্থান স্বপ্ন হলে কিছু বাস্তবতাকে স্বীকার না করে উপায় থাকে না। ব্যাসকম তো সরাসরিই বলেছেন, সব পুরাণের পেছনে বাস্তব ঘটনা

Dhaka University Institutional Repository

থাকবে তার কোনো কারণ নেই; এমনকী প্রতিটি পুরাণের পেছনে যে ব্যক্তিবিশেষের বাস্তব অস্তিত্ব একসময়ে ছিল তাও ব্যাসকম স্বীকার করেন নি। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন পুরাণ মূলত লোক ঐতিহ্যপুষ্ট গল্প। গল্পে বর্ণিত চরিত্র বা ঘটনা কাল্পনিক হতে পারে, তাই বলে তা বাস্তবতাকে অস্বীকার করে না, বাস্তব চরিত্র বা ঘটনার ছায়াপাতেই গল্প রচিত হয়। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে পুরাণকে একেবারে বাস্তব বিবর্জিত সম্পূর্ণ কাল্পনিক বিবরণ বলা যায় না। পুরাণ যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা সামাজিক জীব; তাঁদের বাস্তব অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। তাঁরা যাদের জন্যে পুরাণ রচনা করেছিলেন বা যাদের কাছে পুরাণগুলো বলতেন, তারাও ছিল সমাজের মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই পুরাণ রচয়িতাদের রচনায় সমসাময়িক সমাজজীবন এবং সেই সমাজজীবনের প্রচলিত রীতি-নীতি, বিশ্বাস ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে। অবিমিশ্র কল্পনার ফসল হলে পুরাণের সাহিত্যিক কিংবা নান্দনিক ব্যাখ্যা নিয়েই পণ্ডিতমণ্ডলী মাথা ঘামাতেন, তা থেকে প্রাচীন সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণের সন্ধানে ব্রতী হতেন না। সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পুরাণগুলো থেকে লভ্য। কেউ কেউ যে মন্তব্য করেছেন লোকপুরাণগুলো প্রাচীন ও বিস্মৃত প্রায় সভ্যতার ফসল, তা মোটেই অত্যুক্তি নয়। আপাতভাবে লোকপুরাণগুলি যতই অবাস্তব কিংবা অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের আধার বলে মনে হোক, বাস্তবে কিন্তু এসবের অন্তরালে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সত্য লাভ করি। বাচ্যার্থের দিক থেকে অবশ্য পুরাণগুলোকে যে নিছক কাল্পনিক বলা হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই অযথার্থ নয়।

সচরাচর মানুষ তার সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করতে অনীহা প্রকাশ করে। বিশেষত যেক্ষেত্রে তার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা মর্যাদার পরিপন্থীরূপে আত্মপ্রকাশ করে সেক্ষেত্রে মানুষ অহংবোধের দ্বারা চালিত হয়। তখন পরিণত বয়সের আভিজাত্য কিংবা সামাজিক মর্যাদা রক্ষার তাগিদে যথাসম্ভব কল্পিত কাহিনীর আশ্রয় নিয়ে থাকে। গোষ্ঠীর অন্তর্গত কোনো সদস্য গোষ্ঠীপতিকে তার কৌতূহল সঞ্জাত কোনো প্রশ্ন করলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীপতি কিংবা ভক্তের কাছে পুরোহিত নানা কাহিনী বলে থাকতে পারেন, যেগুলো পুরাণের মর্যাদা লাভ করেছে। বিশেষত যে সময়ে যাচাই করার তেমন কোনো উপায় ছিল না, সে সময়ে মানুষ অবলীলাক্রমে শুধু বিশ্বাস করেই এসেছে। সংশয় প্রকাশের সুযোগই তখন ছিল না। সৃষ্টি সম্পর্কিত নানা কাহিনী যে এমনভাবে উদ্ধৃত হয় নি, এমন কথা জোর দিয়ে কে বলবে? ই. ই. কেলেট (E.E. Kellet) তাঁর *'The Story of Myth' (1927)* গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন *[ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৯১: ১৫]*—

> I should imagine that the fathers of 30,000 B.C. were just as anxious to maintain the fiction of their omni science as the parents and schoolmasters of today.

ভীতিভাবনা থেকেও লোকপুরাণের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। মানুষ মেঘের গুরু-গম্ভীর গর্জন, বিদ্যুতের চমক, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, দিনের পর রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের আবির্ভাব দেখে সন্ত্রস্ত হয়েছে। এরপর এইসব প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে নিজেদের বুদ্ধি ও কল্পনা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কথা সকলের মাথায় যেমন আসে না; তেমনি সব ব্যাখ্যাই গৃহীত হয় না। অনেক ব্যাখ্যার মধ্যে যেগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মানুষের মনে হয়েছিল সেগুলো

Dhaka University Institutional Repository

গৃহীত হয়েছে। রোষ, ক্ষোভ বা প্রতিহিংসার সঙ্গে যুক্ত করে এইসব সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী প্রাকৃতিক বিপর্যয়, পরিবর্তন বা ঘটনগুলোকে ব্যাখ্যা করে মানুষ সেগুলোকেই যথার্থ বলে গ্রহণ করে এসেছে। ক্রমে তা পুরাণের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

বিশেষ একসময়ের বিশেষ এক সমাজের মানুষের গল্প শোনার বাসনা এবং সেই বাসনা চরিতার্থতার জন্যে যেমন রূপকথা, উপকথা ইত্যাদি লোককথাগুলোর উদ্ভব হয়েছে, মূলত, কাহিনীনির্ভর লোকপুরাণের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশও এইভাবে সৃষ্ট হয়ে থাকবে। অর্থাৎ শ্রোতার মনোরঞ্জন করাকে পুরাণ সৃষ্টির অন্যতম কারণ রূপে অভিহিত করা চলে। মানুষ কেবল ভয় পায় না, অপরিচিত অনভিপ্রেত ঘটনা বা পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে দুর্বার প্রতিরোধ স্পৃহাকেও জাগিয়ে তোলে।

মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হলো একের সঙ্গে অন্যের তুলনা করা। সাহিত্য প্রধান অলংকারই হলো এই তুলনামূলক উপমা। দুই অসম বিষয়ের প্রাণীর বা বস্তুর সঙ্গে তুলনায় মানুষের প্রবণতা অনুরূপভাবে একটি ঘটনা দেখে অন্য এক ঘটনার সামঞ্জস্য কল্পনা থেকেও বহু লোকপুরাণের সৃষ্টি হয়ে থাকবে। মানুষ দেখে কীভাবে প্রাণীকুলের জন্ম হয়, কখনও বা স্ত্রী প্রাণীর গর্ভ থেকে, কখনও ডিম থেকে। বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি সম্পর্কিত লোকপুরাণগুলোও এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রূপেই পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের ঐতিহ্যে পুরাণের স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে দেখা যায়, আদিম মিথ থেকে যেমন একইভাবে গ্রিক মিথোলজি এবং আমাদের পুরাণবৃত্ত গড়ে উঠেছে, তেমনই আমাদের পৌরাণিক সংস্কৃতি কিছুটা আবার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেও উজ্জ্বল। গ্রিক পুরাণকথার সঙ্গে যে ধর্মধারা এবং আচার-সংস্কার জড়িত ছিল, তা দীর্ঘকাল আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে আমাদের পুরাণকথার সঙ্গে সম্পৃক্ত ধর্মভাবনা এখনও চলমান। একথা সত্য যে, পুরাণের আবেদনে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মীয় প্রভাব থাকে। যেখানে দেব-দেবীর প্রসঙ্গ নেই, সেখানেও ধর্মভাবের প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষই সেখানে দেবতার পর্যায়ে উঠেছে। একসময় এইসব কাহিনীর সঙ্গে কোনো আচার-অনুষ্ঠান যুক্ত ছিল, পরবর্তীকালে শুধু রয়ে গেছে কাহিনী। কিন্তু এই কাহিনী বিবৃতির সময় পবিত্র মানসিকতার ভাবটি অজ্ঞাজ্ঞিভাবে জুড়ে রয়েছে পুরাণের দেহে।

বহু শতাব্দীর এই অবিচ্ছিন্ন ধর্মধারা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পুরাণকেন্দ্রিক সাহিত্যের মধ্যে দ্বিমাত্রিকতার সৃষ্টি করেছে। ঈসকাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিদিসের সাহিত্যসৃষ্টির সময়ে প্রাচীন ধর্মধারা অব্যাহত ছিল বলেই তাঁদের লেখায় সামাজিক এবং মানবীয় অভিজ্ঞান যতই সুস্পষ্ট থাকুক না কেন, মূলত সেগুলোর উপলক্ষ ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানই। পরবর্তীকালে প্রাচীন ধর্মধারার বিলুপ্তি ঘটলে পুরাণকেন্দ্রিক যে সাহিত্য গড়ে ওঠে, তার সঙ্গে আর কোনোভাবেই ধর্মীয় পবিত্রতার সম্পর্ক থাকে না। পক্ষান্তরে আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উত্তরকালের পুরাণনির্ভর সাহিত্যের মধ্যে ধর্মভাবনাসম্পৃক্ত বা ধর্মভাবনাহীন এই দু ধরনের মনোভাবই পরিস্ফুট হয়েছে। এজন্যে একালে যখন জেমস জয়েস গ্রিক-পুরাণের কাহিনীর কাঠামোকে প্রত্নপ্রতিমা হিসেবে গ্রহণ করে আধুনিক ডাবলিন শহরের পটভূমিকায় 'ইউলিসিস' উপন্যাস লেখেন, তখন তাঁর সৃষ্টির যে পরিবেশটি তিনি পান; তার সঙ্গে মাইকেল মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ রামায়ণ কাহিনীর যে পুনর্বিন্যাস করেন, তার পরিবেশিক পার্থক্যটা খুবই প্রকট।

এই কারণেই পাশ্চাত্য প্রাচীন মিথ সমস্ত রকম ধর্মীয় আবেগ বর্জন করে এখন নিছক সৃষ্টির উপকরণ বলেই গণ্য হয়। পক্ষান্তরে, আমাদের প্রাচীন পুরাণকথা, যা মূলত রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে সংকলিত এদেশে সাহিত্য স্রষ্টাদের লেখার মধ্যে সেই স্বচ্ছন্দ পরিবেশটিকে সবসময় পেতে দেয় না। এই সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

বিভাজনের কারণেই ইউরোপীয় অর্থে মিথের অর্থাৎ আমাদের পুরাণের চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। আমাদের যা পুরাণ, তার মধ্যে মিথ, ইতিহাস, কিংবদন্তী এবং লোককথা এমনভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে রয়েছে যে বহুক্ষেত্রেই পুরোদস্তুরভাবে যাকে মিথ বলা যায়, তাকে আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। আসলে পুরাণকে এখন আমরা বহু সময়েই সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠি বলে মনে করি। সেইজন্যেই সীতার মতো আনুগত্য, লক্ষ্মণের মতো ভ্রাতৃভক্তি, বিভীষণের মতো বিশ্বাসঘাতকতা, কুন্তির মতো ধূর্ততা, যুধিষ্ঠিরের মতো সত্যবাদিতা, ভীষ্মের মতো প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ইত্যাদি ভাবনা বিশিষ্ট ধরনের তাৎপর্য বহন করে।

যদিও ভারতীয় ঐতিহ্যে 'পুরাণ' কথাটির নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় তাৎপর্য আছে, তবু আধুনিককালে প্রধান দুটি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন পাঠে সংকলিত কাহিনীগুলোকেই প্রধানত পৌরাণিক গল্প বলে গণ্য করা হয়। বৈদিক সাহিত্যে প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী পুরাণ ও ইতিহাস সমার্থক। পরবর্তীকালে ইতিহাস, আখ্যান, লোককথা, ধর্মালোচনা, সমাজবিধি, দেবমাহাত্ম্য ইত্যাদি অনেক জিনিসকে সমন্বিত করে যে মিশ্ররূপসম্পন্ন গ্রন্থগুলো রচিত হয়েছে সেগুলোই পুরাণ বলে পরিচিত। স্বর্গ, প্রতিস্বর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত এই পাঁচটি লক্ষণ যে বইগুলোতে আছে, তাদেরকেই ঐতিহ্যবাহী বিচারে পুরাণ বলে ধার্য করা হয়। পুরাণ সম্পর্কে অথর্ববেদে, শতপথ ও গোপথ ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয়, আরণ্যক, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে কয়েকটি গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্রে এবং বিশেষত মহাভারতে অনেক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর সেইসবের অনুসারে ২৮টি মহাপুরাণ এবং অজস্র উপপুরাণ রচিত হয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, পুরাণের জাতি ও সংজ্ঞাসংক্রান্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা ধর্মবিদ পণ্ডিতসমাজের বাইরে আদৌ গৃহীত হয় নি। বরং প্রাচীনকাল থেকে সাধারণ মানুষ এবং সাহিত্য স্রষ্টাদের কাছে ওই রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুটিই পুরাণের আকর-গ্রন্থ হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে।

পুরাণের বৈচিত্র্য

পুরাণের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনায় দেখা গেছে যে, এতে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী থাকে। বাংলা লোকপুরাণের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি টাইপ ইনডেক্সের পরিচয় দেয়া হলো *[দিব্যজ্যোতি মজুমদার ১৯৯৩: ৯২]*—

৪৬০খ	ভাগ্যের খোঁজে যাত্রা
৭০৫	মাছ থেকে জন্ম
৭৫৫	পাপ ও পুরস্কার
৭৫৬	তিনটি সবুজ ডাল
৭৫৬ক	নিষ্পাপ পুণ্যবান সাধু
৭৫৬গ	মহাপাপী
৭৮০	গান-গাওয়া হাড়
৮০২	স্বর্গে কৃক

Dhaka University Institutional Repository

৮১২	দৈত্যের ধাঁধা
৮৩১	অসৎ পুরোহিত।

বাংলা লোকপুরাণকে মোটিফ-ইনডেকসেই ভালো করে সাজানো যায়, এখানে বাংলা লোকপুরাণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ-ইনডেকস দেয়া হলো *[দিব্যজ্যোতি মজুমদার ১৯৯৩: ২২৫-২২৭]* —

এ ২১.১	নারী ও পুরুষ সৃষ্টিকর্তা
এ ১২৩.২.১.২	চতুর্মুখ দেবতা
এ ১২৩.৩.১.২	সহস্রলোচন দেবতা
এ ১২৩.৫.১	বহুভুজ দেবতা
এ ১২৪.১	অগ্নিলোচন দেবতা
এ ১৩১	পশু আকৃতির দেবতা
এ ১৩২	পশুর রূপে দেবতা
এ ১৩৩	দানবরূপী দেবতা
এ ১৩৬.১.৩	বৃষবাহন দেবতা
এ ১৩৬.১.৪.১	হংসবাহন দেবতা
এ ১৩৬.১.৬	মহিষবাহন দেবতা
এ ১৩৬.১.৭	সিংহবাহন দেবতা
এ ১৫১	দেবতাদের আবাসস্থল
এ ১৫১.৮	দুধসাগরে দেবতা
এ ১৫৫.৫	দেবতার রথ
এ ১৬২	দেবতাদের মধ্যে বিরোধ
এ ১৬২১	দেব দানবে যুদ্ধ
এ ১৬৫.২	দেবদূত
এ ৪২১	সাগর দেব
এ ৪২১.১	সাগরদেবী
এ ৪২৫	নদী দেব
এ ৪২৫.১	নদী দেবী
এ ৪৬২.১	রূপের দেবী
এ ৪৬৩	ভাগ্য দেবতা

Dhaka University Institutional Repository

এ ৪৬৩.০.২	ভাগ্য দেবী
এ ৪৬৪	ন্যায়ের দেবতা
এ ৪৭৩.১	সম্পদের দেবী
এ ৪৭৮.২	বসন্তরোগের দেবী
এ ৪৮২.১	দুর্ভাগ্যের দেবী
এ ৪৮২.২	সৌভাগ্যের দেবী
এ ৪৮৭	মৃত্যুর দেবতা
এ ৪৮৮	ধ্বংসের দেবতা
এ ৬৬১	স্বর্গ
এ ৭৫০.৮.১	চাঁদে চরকা-কাটা বুড়ি
এ ১১০১.১	স্বর্ণযুগ

পুরাণ ও বাস্তবতা

লোকপুরাণের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক নিয়ে সমলোচকরা আলোচনা করেছেন আর এই প্রসঙ্গে তাঁরা স্পষ্টতই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। একদল সমালোচক পুরাণকে একেবারেই বাস্তবতা বিরহিত, নিছক কাল্পনিক, মনগড়া কাহিনী বলে যেমন উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, ঠিক তেমনিই অপরপক্ষে অপর শ্রেণির সমালোচক পুরাণকে পুরোমাত্রায় বাস্তব বলে রায় দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, উভয় মতই চরম এবং কোনোটিই একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। একশ্রেণির মতে বলা হয়েছে, পুরাণ কেবল সেই বিষয়েই বলে যা সত্যসত্যই ঘটেছিল, যা নিজেই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। তারা আরও বলেছেন, পুরাণকে পবিত্র গল্প বলে বিবেচনা করা যায়; আর তাই পুরাণ হলো পবিত্র ইতিহাস, কেননা তার সর্বদা বাস্তবকে নিয়েই কাজ।

এদের মতে বলা হয়েছে, পুরাণ কখনোই সাধারণ মিথ্যা নয়। সকল পুরাণই জীবন্ত এবং সত্য বলে এগুলো বিশ্বাসকারীর কাছে প্রতিভাত। সেই সঙ্গে এও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, শুধু পুরাণের বিশ্বাসকারীর কাছেই এগুলো সত্য নয়, বাস্তবিকও এসব সত্য। পুরাণ সচরাচর গল্পের আকারে কোনো কিছুর ব্যাখ্যা দান করে। তারই, যা একসময়ে ঘটেছে অথবা যা প্রতিদিনই ঘটে থাকে।

পুরাণ বিশ্বাসকারীদের কাছে পুরাণ যত সত্য বলেই বিবেচিত হোক, যুক্তিনিষ্ঠ মানুষও যে তা সরল বিশ্বাসে সত্য বলে মেনে নেবে তা স্বাভাবিক নয়। কেননা সরল বিশ্বাসে যা অবাস্তব, অসম্ভব তা সত্য ও যথার্থ বলে গৃহীত হতে পারে না। যুক্তিনিষ্ঠ মানুষ কিন্তু যুক্তিতর্কের দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করে তবেই কোনো কিছুর বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হয়, তার আগে নয়। বিশ্বাসী মানুষ পুরাণকে পবিত্র বলেও গণ্য করতে পারে, এমনকী তা তার কাছে সত্য ইতিহাস বলেও পরিগণিত হতে পারে। কিন্তু মিথ যে বাস্তবতার সঙ্গেই একান্তভাবে সম্পৃক্ত তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। পুরাণে এমন সব চরিত্র ও ঘটনার উল্লেখ থাকে যুক্তি দিয়ে যেগুলোর বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়া যায় না। মানুষের প্রকৃতিই হচ্ছে অতিরঞ্জন করে ঘটনা বা চরিত্র এমনকী বিশেষ অনুভূতি উপলব্ধিকে প্রকাশ করা। ফলে পুরাণে যা প্রকাশিত হয়েছে তার মূলে কিছু সত্য থেকে থাকলেও তা কালের ব্যবধানে এমনই অতিরঞ্জিত, পরিবর্তিত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে যার মধ্যে থেকে প্রকৃত সত্যের সন্ধানলাভ দুরূহ। কারও কারও মতে, পুরাণ একেবারে আদিমযুগে সৃষ্ট, যখন মানুষের কল্পনাশক্তি তত প্রখর ও ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে নি। তাই এর রচয়িতারা যা বাস্তবে দেখেছেন, তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। এক্ষেত্রেও বক্তব্য হলো যে, আদিতে পুরাণ বাস্তবের আনগুত্য করে থাকলেও হুবহু তা যে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তার নিশ্চয়তা কোথায়?

লোকপুরাণগুলোর অবশ্য অন্যবিধ তাৎপর্য আছে, সেটি হলো জাগতিক ক্ষেত্রে সকল প্রকার সৃষ্টির ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে লোকপুরাণের স্রষ্টারা প্রকারান্তরে কার্যকারণ সম্পর্ককে স্বীকার করে নিয়েছে। লোকপুরাণে প্রদত্ত ব্যাখ্যা কাল্পনিক হলেও সকল প্রকার সৃষ্টির মূলে যে নির্দিষ্ট কারণ বিদ্যমান এই বাস্তব সত্যের স্বীকৃতি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

লোকপুরাণে প্রতিফলিত সমাজচেতনা

কার্যকারণ সম্পর্ক নিরূপণ উপলক্ষে লোকপুরাণের সৃষ্টি, তথাপি লক্ষণীয়, পুরাণকাররা তাঁদের সমাজ ও গোষ্ঠীচেতনার পরিচয় পুরাণগুলোতে গোপন রাখতে পারেন নি। অনেক ক্ষেত্রেই সমাজচেতনা প্রেক্ষাপটরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কুসুমপাখির জন্ম রহস্যে যে সত্যটি উদঘাটিত হয়েছে তা আমাদের সমাজবাস্তবতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। পরিবারের অন্যরা যত বড়ই অপরাধ করুক, কিংবা যে কোনো গর্হিত কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকুক, সমাজ তাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলেও একমাত্র খড়্গহস্ত বধূর প্রতি। তরকারির হরিদ্রাবর্ণ দূরীভূত করতে অসমর্থ হওয়ায় অপমান, সমালোচনা ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বধূটির হরিদ্রাবর্ণের পাখিতে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনী তারই প্রমাণ।

ব্যাঙের ছাতা সৃষ্টির মূলে যে সামাজিক রীতি উল্লেখিত হয়েছে, তা হলো আমাদের হিন্দু সমাজে বিধবার আমিষ আহার নিষিদ্ধ সংক্রান্ত। বিধবা নিরামিষাশী হবে সমাজ এটাই চায়। কিন্তু মানুষ সকল সময় সামাজিক রীতিনীতিকে মান্য করতে পারে না, কখনও কখনও মানবিক কারণে তা লঙ্ঘিত হতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ প্রচলিত রীতি-নীতিকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন জানালেও গোপনে সেগুলোকে লঙ্ঘন করে। বিশেষত কামনা-বাসনা, লোভ সবসময় বিসর্জন সম্ভব হয় না। বিধবার মনটি মাংস ভক্ষণের লোভ ত্যাগ করতে পারে নি, তাই গোপনে মাংস ভক্ষণে রত দেখা গেছে এবং পরিচিত ছাইগাদায় পুঁতে ফেলে সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পেতে সচেষ্ট হয়েছে। দুর্গার দশ হাতের অধিকারিণী হওয়ার যে কারণ বর্ণিত হয়েছে, আসলে তার পেছনে প্রাচীন শাস্ত্রের কোনো সমর্থন নেই, আমাদের সমাজে ছেলেরা যতদিন বিয়ে না করে, ততদিন সংসারে মায়ের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু বিরোধ দেখা দেয় সন্তানের বিয়ের পরে। সংসারের কর্তৃত্ব নিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে পুত্রবধূর সম্পর্ক আমাদের সমাজে তাই আদর্শ সম্পর্ক হতে পারে না। পাছে গণেশের বৌয়ের কারণে দুর্গার পেট ভরে খাওয়া না হয়, সেই ভয়ে পুত্র বিয়ের জন্যে নিষ্ক্রান্ত হলে দুর্গার গোগ্রাসে খাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ দুর্গা এখানে নিজের পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন পুত্রবধূর কাছে, স্বীকার করে নিয়েছেন পুত্রবধূর কর্তৃত্বকে।

বিয়ে উপলক্ষে বর সঙ্গে জাঁতি নিয়ে যায়, এও এক সামাজিক প্রথা। গনেশ সেই জাঁতি নিয়ে যেতে ভুলেছিলেন বলেই বিয়ের জন্যে বাড়ি থেকে যাত্রা করেও পুনরায় জাঁতি সংগ্রহ করতে তার গৃহে প্রত্যাবর্তন। কার্তিকের চির কৌমার্যের পেছনেও শাশুড়ি পুত্রবধূর সংঘর্ষের সম্ভাবনা ভূমিকা রেখেছে। তাছাড়া কার্তিকের দর্পণ সংগ্রহের আশায় গৃহে প্রত্যাবর্তন সূচিত করে প্রকাশ করে বিয়েতে দপর্ণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা, বিশেষত বরকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিয়ে করতে যাবার সময় সঙ্গে দর্পণ রাখতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তুলসীগাছ দেখলেই কুকুর যে তাতে প্রস্রাব করে দেয়, এই সম্পর্কিত কাহিনী থেকে জানা যায়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার একটি প্রথার কথা— পিণ্ডদানের অধিকারী পুত্র। পরিস্থিতির কারণে রামচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে সীতা দশরথের পিণ্ডদান করেছিলেন।

হিন্দু সমাজে পতির চিতার অগ্নি নির্বাপিত না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর বৈধব্য বেশ ধারণ নিষিদ্ধ। দু কানে হাত দিয়ে যে আগুনজ্বলার শব্দের মতো শব্দ শোনা যায় তার মূলে এই সামাজিক প্রথাটিই বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে।

শুশুকের জন্মবৃত্তান্তের মূলে রয়েছে স্নানরতা ভাগ্নে বধূর মামাশ্বশুরকে দেখে লজ্জিত হওয়া এবং আত্মগোপনের চেষ্টা। আমাদের সমাজে ভাসুর, ভাদ্দর-বউ, ভাগ্নে-বউ, মামা-শ্বশুর এদের সম্পর্ক বড় জটিল। সেই জটিল ও সূক্ষ্ম সম্পর্কের বিষয়টিই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। শুধু আমাদের পুরাণ কাহিনীই নয়, পৃথিবীর সব দেশের পুরাণের কাহিনী নিজস্ব সমাজের বিভিন্ন রীতি-নীতি বা প্রথাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

ইতিহাসের একটা নিয়ম আছে, সে নিয়মে এখন আর পুরাণ সৃষ্টি হতে পারে না। সংস্কৃত অভিধান অমরকোষে পুরাণের যে লক্ষণ ও নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে সে ধারা গুপ্তযুগের প্রথম দিকেই পুরাণ রচয়িতারা আর পালন করেন নি। ফলে পুরাণ রচনার কাল সেই সময় পর্যন্তই। হাজার হাজার বছর আগে সভ্যতার উষালগ্নে তৈরি হয়েছিল যে পুরাণ, প্রকৃত অর্থেই তখন মৌখিক গল্পের পরম্পরায় সাহিত্যের প্রবাহ অব্যাহত ছিল। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের কত সব খবর এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। কল্পবিজ্ঞান থেকে প্রমাণসিদ্ধ বিজ্ঞানে, জাদু থেকে যুক্তিতে, লোকপুরাণ থেকে কাব্যে আমরা অনেক এগিয়েছি। তবুও কান পাতলেই শোনা যায়, আদিকালের পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস সংস্কারের ভাবধ্বনি। চলমান জীবনে পুরাণের প্রায়োগিক নিদর্শন উল্লেখযোগ্য। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরাণের কার্যকারিতা সম্পর্কে আমরা অবহিত। পুরাণের অন্তর্নিহিত নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ আমাদের অগোচরেও আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে । যে সমস্ত পর্যায়ে শৈশব হতে আমাদের সামাজিকীকরণ শুরু হয় তার প্রতিটি স্তরেই পুরাণের উপস্থিতি পরিলক্ষিত। সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূল অন্বেষণ করতে গেলে দেখা যাবে, বহু দেশেই শ্রেণি, বর্ণ ও বিভিন্ন সামাজিক বিভাজনের মূলে আছে পুরাণের পরিব্যপ্ততা ও উপলব্ধি। সামাজিক বিচলনের ক্ষেত্রেও সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে পুরাণের নিরপেক্ষ নীতি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিকীকরণ, সামাজিক স্তরবিন্যাস ও বিচলনতা এবং সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব ছাড়াও টোটেম, ট্যাবু, বিবাহ পদ্ধতি প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিক বিভিন্ন ধারণার ব্যাখ্যায় পুরাণের সাহায্য অপরিহার্য। সর্বোপরি সাংস্কৃতিক মেল-বন্ধনের ক্ষেত্রে বা অ্যাকালচুরেশনে পুরাণের গৌরবময় ভূমিকা যে কোনো মানবিকচিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হতে বাধ্য। পুরাণের আলোচনায় কয়েকটি সিদ্ধান্ত পুনরাবৃত্তি করা যায়, ১. পুরাণে প্রাক-বৈজ্ঞানিক যুগের বিজ্ঞানভাবনা; ২. বর্তমানের বৈজ্ঞানিক যুগেও পুরাণের প্রভাব। এর কারণ, বিজ্ঞান মানবিক সমাজ কল্যাণকামী, পুরাণও লোকায়ত সমাজনীতির ধারক— অতীত হতে বর্তমানে পুরাণের রূপান্তর এর কারণে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক যুগে পুরাণের উপস্থিতি সহজ করেছে। ৩. মিথের বাস্তবতা অনস্বীকার্য। ৪. পুরাণে অলৌকিক ও অতিমানবিক সত্তার উপস্থিতি থাকলেও পুরাণের নিরপেক্ষ চরিত্রই তার বিশেষ শক্তি। ধর্মীয় নেতারা তাঁদের ধর্মমতের বিশেষ প্রতীক সৃষ্টি করলেও আচার-অনুষ্ঠানের সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁরা সর্বদাই মিথ বা পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা রূপকথায় মিথ-এর প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলা রূপকথাগুলোতে মিথ-এর প্রভাব ও উভয় ধারার মধ্যে কিছু বিষয়ে সাযুজ্য রয়েছে। রূপকথার সাথে যেসব বিষয়ে পুরাণ-এর প্রভাব লক্ষণীয় তা নিচে আলোচনা করা হলো-

১. শুকপাখি

বেশ কটি বাংলা রূপকথায় 'শুকপাখি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখিত 'শুকপাখি' প্রসঙ্গটি মিথ-এর সাথে সাজুয্যপূর্ণ। মিথ বা পুরাণে শুকপাখি তথ্যদাতা বা দূতের কাজে পারদর্শী। পুরাণে শুকপাখিকে মানুষের মতো কথা বলতে পারে এমন পাখি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের বিংশ সর্গে রাক্ষসরাজ রাবণের শার্দুল নামের চর ছিল। সে রাবণের আদেশে সমুদ্রের অপর পাড়ে এসে সুগ্রীব রক্ষিত বানর সৈন্য পর্যবেক্ষণ করে রাবণকে সব জানাল। রাবণ তখন শুককে সুগ্রীবের কাছে গিয়ে নিজের প্রস্তাবের কথা জানাতে বলল। রাবণের আদেশে শুকপাখি সুগ্রীবের কাছে গিয়ে সুগ্রীবকে রাবণের সব কথা বলতে লাগল। এর মধ্যে বানর সৈন্যরা শুকপাখিকে ধরে তার ওপর নির্যাতন করতে উদ্যত হলে সে চিৎকার করে রামকে বলল, দূত হত্যা করা সমীচীন নয়। রামের আদেশে বানর সৈন্যরা শুকপাখিকে ছেড়ে দিল। তখন শুকপাখি অন্তরীক্ষে উঠে বলল *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ৬৫৭]*—

> তখন ধর্মশীল রাম শুকের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া বানরগণকে নিবারণ করিলেন। বানরেরাও শুককে অভয় দান করিল। অনন্তর শুক পক্ষবলে শীঘ্র অন্তরীক্ষে আরোহণপূর্বক পুনর্বার কহিল, কপিরাজ! রাবণ ক্রূরস্বভাব, বল, আমি গিয়া তাঁহাকে কি বলিব।

পুরাণে উল্লেখিত 'শুকপাখি' চরিত্রটি বাংলা রূপকথার বিভিন্ন গল্পে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। বাংলা রূপকথায় তথ্যদাতা হিসেবে শুকপাখি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তারা মানুষের মতো কথা বলে মানুষকে যেমন সহায়তা করে তেমনি কাহিনী সংঘটনে বিভিন্ন মাত্রাও যোগ করে।

'শীত-বসন্ত' গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্র বসন্ত। সে বনের ভেতর মুনির আশ্রমে বাস করে। পৃথিবীর অন্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন বসন্ত। যে রাজ্যের বনে সে বাস করে সে রাজ্যের রাজকুমারী পণ করেছে, যে রাজকন্যাকে গজমোতি এনে দেবে রাজকন্যা তাকেই বিয়ে করবে। মুনির আশ্রমে এক শুক ও এক সারী বাস করে। তারা নিজেদের ভেতর রাজকুমারীর গজমোতি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার সময় বসন্ত সব শুনতে পায় এবং গজমোতি আনার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। তখন শুক এবং সারী কীভাবে বসন্তকুমার গজমোতি আনতে পারবে সে উপায় বলে দেয় *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৪২-৪৩]*—

> মুনির পাতা কুঁড়ে; পাতার কুঁড়েতে এক শুক আর এক সারি থাকে।
> একদিন শুক কয়,
> "সারি, সারি ! বড় শীত"
>
> সারি বলে,–

Dhaka University Institutional Repository

"গায়ের বসন টেনে দিস্!"

শুক বলে,–

"বসন গেল ছিঁড়ে, শীত গেল দূরে,
কোন্ খানে, সারি, ন-দীর কূল ?"

সারি উত্তর করিল, –

"'দুধ-মুকুটে' ধবল পাহাড় ক্ষীর-সাগরের পাড়ে,
গজমোতির রাঙা আলো ঝর্ঝরিয়ে পড়ে।
আলোর তলে পদ্ম-পাতে খেলে দুধের জল,
হাজার হাজার ফুটে আছে সোনা-র কমল ॥"

শুক কহিল, –

"সেই সোনার কমল, সেই গজমোতি
কে আনবে তুলে' কে পাবে রূপবতী!"

শুনিয়া বসন্ত বলিলেন,-

"শুক সারী মেস মাসী
কি বল্ছিল্, বল্,
আমি আনবো গজমোতি
সোনার কমল।"

শুক সারি বলিল,- "আহা বাছা, পারিবি?"

বসন্ত বলিনে,- "পারিব না তো কি!'

শুক বলিল,- "তবে, মুনির কাছে গিয়া ত্রিশূলটা চা!"

সারী বলিল, - "শিমুল গাছে কাপড়-চোপড় আছে
মুকুট আছে, তাই নিয়ে যা।"

'রাজকন্যা' গল্পটিতে যে রাজার কথা বর্ণিত হয়েছে তিনি সম্পদশালী, কিন্তু নিঃসন্তান। রাজার সাত রানি থাকলেও এক রানিরও ছেলে-মেয়ে নেই। রাজার ঐশ্বর্য থাকলেও মনে শান্তি নেই। রাজ্যের সকলের মনে একই দুঃখ, রাজার সন্তান হয় না। রাজপুরীর দিকে খেয়াল রাখার মতো কেউ নেই। দীপ জ্বলতে জ্বলতে নিভে, শাঁখ বাজতে বাজতে থেমে যায়। খাঁচার শুকপাখি আর গান গায় না। চারিদিকে স্থবিরতা *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ১৪৫]* —

> রাজপুরীতে দীপ জ্বলতে নিভে। রাজপুরীর শাঁখ বাজতে বাজতে থামে। পিঞ্জরে শুক শারী গাইতে গাইতে, চুপ।

'কমল সায়র' গল্পে এক রাজপুত্রের তিনটি পাখি– শুক, সারস আর ময়ূর। রাজপুত্র স্নান করতে গেলে সারস তার আগে চলে। রাজপুত্র মৃগয়ায় গেলে ময়ূর তার রথে বসে। আর শুকপাখি তিন মাস পর পর তিনটি শুধু

Dhaka University Institutional Repository

কথা বলে– 'রাজপুত্র! চলেছে, চল।' রাজপুত্র সাত বছর ধরে ঐ একই কথা শুনে আসছিল। অন্য কোনো কথা শুক বলে না। রাজপুত্রের বারবার একই প্রশ্ন– কোথায় চলেছি শুক? কিন্তু, শুক অন্য কোনো কথা বলে না *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ১০৬]* —

রাজপুত্র।
তিনটি তাঁর পোষা পাখী।
শুক, সারস আর ময়ূর।

রাজপুত্র যেদিন সরোবনে যান স্নানে, সারস চলে তাঁর আগে আগে। রাজপুত্র যখন বনে যান মৃগয়ায়, পেখম খুলে, ময়ূর বসে তাঁর রথে। আর শুক, তিন মাস পর পর, তিনটি শুধু কথা, বলে রাজপুত্রের কাছে।

শুক বলে, 'রাজপুত্র! চলেছ, চল।'

শুধু এই তিনটি কথা।

আর কিছুই, শুক, বলে না।

সাত বছর রাজপুত্র শুক পোষেন। সাত বছর শুকের একই কথা শোনেন। সর্বপ্রথম যখন শুনলেন, রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় চলেছি শুক?'
শুক, আর, কিছুই বললে না।
তিন মাস পরও সেই কথা।
আরও তিন মাস।
রাজপুত্র ভাবলেন, ওকথা, শুকের শুধু, বলি।
রাজপুত্র আর কিছুই বললেন না।

প্রভাব : শুকপাখি পৌরাণিক পাখি। বাস্তবে এখন এর অস্তিত্ব নেই। রূপকথার গল্পগুলোতে তাই শুকপাখির উল্লেখে পুরাণের প্রভাব রয়েছে বলে মনে হয়।

পার্থক্য : পুরাণে শুক নামের রাক্ষস শুকপাখির রূপ ধারণ করলেও রূপকথাতে তেমনটি ঘটে নি। পুরাণে শুকপাখিকে দূত হিসেবে দেখানো হলেও রূপকথাতে তা মূলত সখের পাখি, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্যদাতা হিসেবে দেখানো হয়েছে।

'শুকপাখি' পৌরাণিক পাখি হলেও রূপকথাতে রূপকথার চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তা নিজের মতো করে প্রকাশিত হওয়ায় এরকম পার্থক্য দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

২. পশু-পাখির মানুষের মতো কথা বলা

বাংলা রূপকথায় পশু-পাখির মানুষের মতো কথা বলার যে চিত্র পাওয়া যায় তা বিভিন্ন মিথেও পাওয়া যায়। বিভিন্ন পুরাণ কাহিনীতেও দেখা যায়, পশু-পাখি মানুষের ভাষায় কথা বলে ঘটনাতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। আর তারই প্রভাব পড়েছে বাংলা রূপকথাতে।

মহাভারতের বনপর্বে পাণ্ডবরা কপট পাশাখেলায় কৌরবদের কাছে পরাজিত হয়ে যখন বনে যান তখন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে এ অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। পরে ব্যাসদেবের কাছে তিনি এ সত্য স্বীকার করেন। ব্যাসদেবও পুত্রস্নেহের এ চিরন্তন রূপকে মেনে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে একটি আখ্যান শোনান। এ আখ্যানে তিনি গোমাতা ও গোশিশুর বর্ণনা দেন। সেখানে বর্ণিত গোমাতাও মানুষের ন্যায় ইন্দ্রের সাথে কথা বলেছে *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ১৪৫]*—

> পূরাকালে একদা গোমাতা সুরভীকে কাঁদতে দেখে ইন্দ্র তাঁর শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সুরভী বললেন, দেখুন আমার ওই ক্ষুদ্র পুত্র লাঙ্গালের ভারে পীড়িত হয়ে আছে, কৃষক তাকে কষাঘাত করছে।

এছাড়া পাণ্ডবদের বনে থাকার সময় যুধিষ্ঠিরের মনোকষ্ট দূর করবার জন্যে মহর্ষি বৃহদশ্ব নল রাজার যে আখ্যান শুনিয়েছিলেন সেখানেও কনকবর্ণ এক হংস মানুষের মতো কথা বলেছে। নলের কাছে ধরা পড়ে কনকবর্ণ সেই হংস সুন্দরী দয়মন্তীর কাছে নলের বার্তা পৌঁছে দেবার প্রতিজ্ঞা করে *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ১৬৪]*—

> একদিন নল উদ্যানে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কনকবর্ণ হংস দেখতে পেলেন। তিনি একটিকে ধরলে সে বললে, রাজা, আমাকে মারবেন না, আমি আপনার প্রিয় কার্য করব, দয়মন্তীর কাছে গিয়ে আপনার সম্বন্ধে এমন ক'রে বলব যে তিনি অন্য পুরুষ কামনা করবেন না।

যুধিষ্ঠির-এর অনুরোধে কার্মাডেয় বৈবস্বত এক মাছের আখ্যান বর্ণনা করেন। বিবস্বানের পুত্র মনু রাজ্যলাভের পর রদবিকাশ্রমে গিয়ে তপস্যা করার সময় এক ক্ষুদ্র মৎস্যচারিণী মনুকে বলবান মৎস্যদের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে অনুরোধ করে। মনু মাছটিকে ক্রমান্বয়ে জালা, পুষ্করিণী, গঙ্গায় আর সমুদ্রে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করলে মাছটি কৃতজ্ঞ হয়ে মানুষের ভাষায় কথা বলে মনুকে সৎপরামর্শ দান করে *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ২১৭]*—

Dhaka University Institutional Repository

> মনু যখন তাকে সমুদ্রে ফেললেন তখন সে সহাস্যে বললে, ভগবান, আপনি আমাকে সর্বত্র রক্ষা করেছেন, এখন আপনার যা কর্তব্য শুনুন। – প্রলয়কাল আসন্ন, স্থাবর জঙ্গম সমস্তই জলমগ্ন হবে।

রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডে রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় জটায়ু রাবণকে মানুষের ভাষায় এ ধরনের অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করেন *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ৩৮০]*—

> তৎকালে জটায়ু নিদ্রিত ছিলেন, এই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র, রাবণকে দেখিতে পাইলেন এবং জানকীকেও দর্শন করিলেন। তখন ঐ গিরিশৃঙ্গাকার প্রখরতুণ্ড বিহঙ্গ বৃক্ষ হইতে কহিতে লাগিলেন, রাবণ! আমি সত্যসঙ্কল্প, ধর্মনিষ্ঠ ও মহাবল। আমি পক্ষিগণের রাজা, নাম জটায়ু। ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমার সমক্ষে এইরূপ গর্হিতাচরণ করা তোমার উচিত হইতেছে না।

'পশু-পাখির মানুষের মতো কথা বলা' মিথ-এ উল্লেখিত এই বিষয়টি বাংলা রূপকথার বিভিন্ন কাহিনীতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। রূপকথার এই বিষয়টিতে পুরাণের প্রভাব লক্ষ করা যায়। রূপকথা রাজ্যের বহু গল্পেই পশু-পাখির এমন সব চরিত্র পাওয়া যায় যারা মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে।

'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে বর্ণিত দুটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র ভুতুম একটি পেঁচা আর বুদ্ধু একটি বানর। গল্পে উল্লেখিত রাজার সাত রানি সন্তান লাভের আশায় সন্ন্যাসী কর্তৃক প্রাপ্ত একটি গাছের শিকড় ভক্ষণ করে। শিকড়টি কেটে সব রানিকে অল্প অল্প করে খেতে দেখা যায়। ন-রানির আর ছোট রানির জন্যে অবশিষ্ট কিছুই থাকে না। ন-রানি তবু বাটির তলানীতে পরে থাকা একটুখানি শিকড় বাটা পায়। কিন্তু ছোট রানি এসে দেখে তার জন্যে কিছুই রাখা হয় নি। সে তখন কষ্টে আঙ্গিনায় গড়াগড়ি যেতে যেতে চোখের জলে আঙিনা ভাসায় এবং শিল নোড়াতে যেটুকু শিকড় বাটা লেগে থাকে তা ধুয়ে জল খায়। পরে দেখা যায়, বড় পাঁচ রানির পাঁচ সোনার চাঁদ ছেলে জন্মগ্রহণ করে আর ন-রানি ও ছোট রানির যথাক্রমে একটি পেঁচা আর একটি বানর জন্মগ্রহণ করে। তবে তারা মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে। বড় পাঁচ রানির রাজপুত্রেরা রাজসভায় ছুটে বেড়ায়, ন-রানি আর ছোট রানি ভুতুম আর বুদ্ধুকে নিয়ে চিড়িয়াখানার বাদী ও ঘুঁটে কুড়ানী দাসী হয়ে জীবন যাপন করে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৬-৭]*—

> ভাবিয়া তাহারা বলিল, –"ও ভাই রাজপুত্র, আমাদিগে আনিয়াছ, তো, মাদিগেও আন।"
>
> রাজপুত্রেরা দেখিলেন,– বাঃ! ইহারা তো মানুষের মত কথা কয়! তখন বলিলেন– "বেশ্ বেশ্, তোদের মায়েরা কোথায় বল্; আনিয়া চিড়িয়াখানায় রাখিব।"
>
> ভূতুম্ বলিল, "চিড়িয়াখানার বাঁদী আমার মা।"
>
> বুদ্ধু বলিল, "–"ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী আমার মা।"

Dhaka University Institutional Repository

রাজপুত্রেরা একদিন চিড়িয়াখানায় গিয়ে ভূতুম্ আর বুদ্ধুকে ধরে নিয়ে আসার প্রেক্ষিতে ভূতুম্ আর বুদ্ধুর উপরি-উক্ত সংলাপ বলে। পরে কাহিনীতে দেখা যায়, বিভিন্ন ঘটনার স্রোতের মধ্য দিয়ে ভূতুম্ আর বুদ্ধু গুরুত্বপূর্ণ দুটি চরিত্রে পরিণত হয়।

পশু-পাখির মানুষের মতো কথা বলার এরকম কাহিনী পাওয়া যায় 'শীত-বসন্ত' গল্পে। এ গল্পের দুই রানির মধ্যে সুয়োরাণী দুয়োরাণীকে ওষুধের প্রভাবে টিয়া পাখি বানিয়ে রাজ্য ছাড়া করে। দুঃখিনী এই দুয়োরাণী টিয়া পাখি হয়ে আশ্রয় পায় এক রাজকন্যার ঘরে। কথা বলে মানুষের মতোই *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৪০]* —

> রূপবতী রাজকন্যা আপন ঘরে সিঁথিপাটি কাটিয়া, আল্‌তা কাজল পরিয়া, সোনার টিয়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, –
>
> "সোনার টিয়া, বল, তো আমার আর কি চাই?"
>
> টিয়া বলিল –
>
> "সাজ তো ভাল কন্যা, যদি সোনার নূপুর পাই!"
>
> রাজকন্যা কৌটা খুলিয়া সোনার নূপুর বাহির করিয়া পায়ে দিলেন। সোনার নূপুর রাজকন্যার পায়ে রুণু ঝুণু করিয়া বাজিয়া উঠিল। রাজকন্যা বলিলেন, –
>
> "সোনার টিয়া বল তো আমার আর কি চাই ?
>
> টিয়া বলিল, –
>
> "সাজ তো ভাল কন্যা, যদি ময়ূরপেখম পাই!"

'নীলকমল আর লালকমল' গল্পেও পাওয়া যায়– বেজামা আর বেজামী নামের দুটি পাখি চরিত্র যারা মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে। এ গল্পে রাক্ষসী সৎমার কাছ থেকে অত্যাচারিত হয়ে নীলকমল আর লালকমল রাজ্য ছাড়া হয়। পথে যেতে যেতে এক বনের মধ্যে তারা শুনতে পায় বেজামা-বেজামীর কথা *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৭৩]* —

> সেই অশ্বত্থ গাছে বেজামা-বেজামী পক্ষীর বাসা। বেজামী বেজামকে বলিতেছে, –"আহা, এমন দয়াল কা'রা, দু'ফোঁটা রক্ত দিয়া আমার বাছাদের চোক ফুটায়!"
>
> শুনিয়া, লাল নীল বলিলেন, – "গাছের উপরে কে কথা কয়? – রক্ত আমরা দিতে পারি।"
>
> বেজামী "আহা আহা" করিল।
>
> বেজাম নীচে নামিয়া আসিল।
>
> দুই ভাই আঙ্গুল চিরিয়া রক্ত দিলেন।
>
> রক্ত নিয়া বেজাম বাসায় গেল; একটু পরে সোঁ সোঁ করিয়া দুই বেজাম বাচ্চা নামিয়া আসিয়া বলিল, –"কে তোমরা রাজপুত্র আমাদের চোক ফুটাইয়াছে? আমরা তোমাদের কি কাজ করিব বল।"

Dhaka University Institutional Repository

পরে রাজপুত্রদের উপকারের প্রতিদানে পাখিরাও তাদের উপকার করে।

'শিয়াল পণ্ডিত' গল্পের প্রধান চরিত্র একটি শিয়াল। যে মানুষের ভাষায় কথা বলে। তার পাঠশালায় কুমীর তার বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখানোর জন্যে নিয়ে আসে। কুমীরও মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে এখানে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ১০৭]* —

> দেখিয়া শুনিয়া এক কুমীর ভাবিল, – "তাই তো! সকলের ছেলেই লেখাপড়া শিখিল, আমার ছেলেরা বোকা হইয়া থাকিবে?" কুমীর, শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায় সাত ছেলে নিয়া গিয়া হাতে খড়ি দিল।
>
> ছেলেরা আঞ্জি ক খ পড়ে। শিয়াল বলিল, –"কুমীর মশাই, দেখেন কি, – সাতদিন যাইতে-না-যাইতেই আপনার এক এক ছেলে বিদ্যাগজ্‌গজ্‌ ধনুর্ধর হইয়া উঠিবে।"
>
> মহাখুশী হইয়া কুমীর বাড়ী আসিল।

'রাজকন্যা' গল্পের রাজা সাত রানি বিয়ে করে, কিন্তু সন্তানের সুখ দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয় না। অনেক যাগ, যজ্ঞ, পূজা অর্চনা করেন সন্তানের আশায়, কিন্তু সব বৃথা যায়। অবশেষে দক্ষিণের নীল সমুদ্রে এক নীল পাখি মানুষের ভাষায় কথা বলে তাঁদের সন্তান লাভের পথ বলে দেয় *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ১৪৫]* —

> পাখা মেলে এক নীল পাখী বললে,
> 'নীল আকাশে তারার বন,
> গায়ে মাখ' চন্দন।
> চন্দনে চাঁদমুখ
> রাজকন্যা অনুপম।'

'মালঞ্চমালা' গল্পে বারো দিনের রাজপুত্রের সাথে বারো বছরের মালঞ্চের বিয়ে হয়। ঘটনাক্রমে স্বামীকে নিয়ে রাজ্যছাড়া হয়ে জনমানুষের বসতিহীন বনে এসে পড়ে মালঞ্চ। সেখানে এক বাঘের সাথে দেখা হয় তার। বাঘ মানুষের মতো কথা বলে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৩৮২]* —

> জনমানুষের বসতি কোথায় – বিয়ানো গাইয়ের দুধ কোথায়, – প্রকাণ্ড এক কেঁদো বাঘ–"হালুম! হালুম! খালুম!!" করিয়া বাহির হইল! বলে, – 'বা হা বা! অনেক দিনের উপোসী আছি, শিকার ধরি বল নাই; কন্যা? এই ছেলে আমি খা'ব!"

Dhaka University Institutional Repository

পরে এই বাঘের উপকারের ফলেই মালঞ্চের জীবনে সুখ ফিরে আসে।

'শঙ্খমালা' গল্পের সওদাগর পুত্র শঙ্খমণি। বাণিজ্যে তার মন নেই। সওদাগর ছেলেকে বোঝান বাণিজ্যে যাওয়ার জন্যে, কিন্তু সে বাণিজ্যে যেতে চায় না। একদিন এক বক আসে সওদাগরপত্নীর কাছে। মানুষের ভাষায় কথা বলে সে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৪৩১]*—

> একদিন এক বক আসিয়া খবর দিল, –"মা যাগ কর না যজ্ঞ কর না, গাব দাও না গব্য দাও না, জলের তলে চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর তো, সাপ কুমীর হইয়া ঘর সংসারের লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়! "

একসময় বাণিজ্যে যায় শঙ্খমণি। পাহাড়ের কাছের এক নদীর তীরে ডিঙ্গা ভিড়ায় শঙ্খ। শুনতে পায় বেঙ্গামা-বেঙ্গামী পাখির মানুষের ভাষায় কথা বলা *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৪৩৭]* —

> সেই গাছে বেঙ্গামা-বেঙ্গামী দুই পক্ষী-পক্ষিণী থাকে। বেঙ্গামা বলে, –বেঙ্গামী! এই যে শঙ্খসাধু বাণিজ্যে যায়, আজ এই শঙ্খ সাধুর ঘরে নীলমাণিক রাজার জন্ম হইবে!"
>
> বেঙ্গামী বলে, – "বেশ কথা! সাধু যায় বাণিজ্যে, বাড়ী ঘর রহিল তা'র ছয় মাসের পথ দূরে, সেই সাধুর ঘরে রাজার জন্ম! – বেশ বলিয়াছ।"
>
> বেঙ্গামা কয়, –"বেঙ্গামী, বিশ্বাস করিলে না? ঐ নদীর ও-পারে মানিক-হংস নামে এক পক্ষ আছে। স্নান করিয়া উঠিয়া, সাধু, 'মনিক হংস' বসিয়া ডাক দিলেই, সেই পাখী আসিয়া সাধুকে পিঠে করিয়া ছয় মাসের পথ প্রহরে নিয়া যাইবে, প্রহরে ফিরাইয়া! আনিবে।"

বেঙ্গামা বেঙ্গামীর কথামতো নদীর পারে এসে 'মানিক-হংসকে' ডাক দেয় শঙ্খমণি। এই মানিক হংসও মানুষের ভাষায় কথা বলে শঙ্খমণির সঙ্গে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৪৩৭]*—

> সাধুর আজ্ঞিনায় সাধুকে নিয়া নামাইয়া দিয়া পাখী বলিল, – "শঙ্খমণি, এই তোমার ঘর! আবার যখন ফিরিবে, 'মাণিক' বলিয়া ডাক দিও।"
>
> শঙ্খ, আস্তে, শক্তির দুয়ারে গিয়া ডাকিলেন –

শঙ্খমণি তার বউ-এর সঙ্গে দেখা করে আবার হাঁসের পিঠে চড়ে আগের স্থানে ফিরে আসে। ঘটনাক্রমে শঙ্খমণির স্ত্রী গ্রামছাড়া হয়ে বনে কাঠুরের কাছে সাহায্য নিয়ে এক কুঁড়ে ঘর তৈরি করে বসবাস করে।

Dhaka University Institutional Repository

কাঠুরের বউ শক্তির ঘরের এক টিকটিকিও মানুষের ভাষায় কাঠুরাণীর সাথে কথা বলে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৪৪৮]*—

> ঘরে এক টিক্‌টিকি ছিল,'টিক্ টিক্' করিয়া কয় – "ও কাঠুরাণী! ঠিক! ঠিক! তা যদি করিস্ তো রাজপুরে যা, ডায় ডাকিনী আছে, নিয়া আয় ওষুধ বিষুধ কর্‌বে, –

'কমল সায়র' গল্পের রাজপুত্রের তিনটি পোষা পাখি শুক, সারস আর ময়ূর। পাখি তিনটিই মানুষের ভাষায় কথা বলে আর রাজপুত্রকে বিভিন্ন অজানা তথ্য দেয় *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ১৬০]*—

> একদিন, রাজপুত্র চলেছেন মৃগয়ায়।
> ময়ূর বললে, 'রাজপুত্র! শুক কি বলে, আমি জানি।'
> রাজপুত্র চেয়ে রইলেন।
> ময়ূরের মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে, জিজ্ঞেস করলেন – "তুমি কি জান ময়ূর?"
> ময়ূর বললে, 'রাজপুত্র, এক দেশে এক রাজকন্যা, ঘুমে। সে ঘুম ভাঙে না ভাঙবেও না। যদি কেউ ভাঙাবে, তো, সে থাকবে হীরে হয়ে।
> কিন্তু, রাজকন্যা যে-ঘুমে, সে-ঘুমে'
> 'কোন দেশে?'
> ময়ূর বললে, 'তা জানি না।'

প্রভাব : মিথ-এর এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রূপকথার বিশাল ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। পশু-পাখির মানুষের মতো কথা বলা পুরাণের বিষয় এবং তা রূপকথায় প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে।

পার্থক্য : পুরাণে প্রত্যেকটি প্রাণীকে ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে অংকন করা হলেও রূপকথার প্রায় প্রাণীই ঋনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। মিথ-এ পশু-পাখির কথোপকথনের ভেতরে যুক্তি ও ধর্মীয় দর্শন থাকলেও রূপকথায় প্রাণীদের কথা খুবই হালকা ভাবের এবং তাতে ধর্ম ও যুক্তির প্রাধান্য নেই।

মিথ বা পুরাণ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যসমৃদ্ধ কাহিনী, কিন্তু রূপকথা লোক-মুখে প্রচারিত কাহিনীরই বিভিন্ন রূপ। তাই মিথ-এর পশু-পাখির গাম্ভীর্য রূপকথায় বর্ণিত পশু-পাখির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

৩. পশু কর্তৃক পশুকে ঠকানো

'পশু কর্তৃক পশুকে ঠকানো' বাংলা রূপকথায় বর্ণিত এ বিষয়টি পুরাণ-এর সাথে সাজুয্যপূর্ণ। পুরাণের বিভিন্ন আখ্যানে পৌরাণিক চরিত্রের মুখে যেসব উপাখ্যান উচ্চারিত হয়েছে তাতে এ ধরনের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

মহাভারতের সভাপর্বে শিশুপাল ও ভীষ্মের মধ্যে যে বাগ্‌যুদ্ধ হয় তাতে শিশুপাল একটি উপাখ্যান শোনান। তাতে বলা হয়, এক বৃদ্ধ হাঁস সবসময় সত্য উপদেশ দিত। সরল বিশ্বাস করে অন্য পাখিরা তাকে খাদ্য জোগাড় করে দিত এবং নিজেদের ডিমগুলো তার কাছে রেখে দিত। কিন্তু সেই হাঁস পাখিদের ডিম খেয়ে ফেলত *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ১১৯]*—

> এক বৃদ্ধ হংস সমুদ্রতীরে বাস করত, সে মুখে ধর্মকথা বলত কিন্তু তার স্বভাব অন্যবিধ ছিল। সেই সত্যবাদী হংস সর্বদা বলত, ধর্মাচরণ কর, অধর্ম ক'রো না। জলচর পক্ষীরা সমুদ্র থেকে খাদ্য সংগ্রহ ক'রে তাকে দিত এবং তার কাছে নিজেদের ডিম রেখে চরতে যেত। সেই পাপী হংস সুবিধা পেলেই ডিমগুলি খেয়ে ফেলত।

'পশু কর্তৃক পশুকে ঠকানো' পুরাণে উল্লেখিত এ ধরনের বিষয় বাংলা রূপকথায় পাওয়া যায়। রূপকথার এ ধরনের গল্পে পুরাণের প্রভাব লক্ষণীয়।

'শিয়াল পণ্ডিত' গল্পে শিয়াল খুবই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। কুমির তার তুলনায় বোকা। শিয়াল পণ্ডিত এক পাঠশালা খুলে বসে। সে বিভিন্ন প্রাণীর বাচ্চাদের শিক্ষা দিতে লাগল। তবে তার পেছনে দুরভিসন্ধি কাজ করেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, এসব প্রাণীর বাচ্চাদের শিক্ষা দেয়ার নামে উদরপূর্তি। কিন্তু বোকা কুমির তা বুঝতে না পেরে তার সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্যে শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়তে দেয়, কিন্তু শিয়াল কুমিরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সাত দিনে তার সাতটি বাচ্চা খেয়ে ফেলে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ১০৭-১০৮]*—

> দেখিয়া শুনিয়া এক কুমীর ভাবিল, – "তাই তো! সকলের ছেলেই লেখাপড়া শিখিল, আমার ছেলেরা বোকা হইয়া থাকিবে?" কুমীর, শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায় সাত ছেলে নিয়া গিয়া হাতে খড়ি দিল।
>
> ছেলেরা আঞ্জি ক খ পড়ে। শিয়াল বলিল, – "কুমীর মশাই, দেখেন কি, –সাতদিন যাইতে-না-যাইতেই আপনার এক এক ছেলে বিদ্যাগজ্‌গজ্‌ ধনুর্ধর হইয়া উঠিবে।" মহা খুসী হইয়া কুমীর বাড়ী আসিল। পণ্ডিত মহাশয় পড়ান, রোজ একটি করিয়া কুমীরের ছানা দিয়া জল খান। এই রকম করিয়া ছয় দিন গেল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব : পশুর প্রতি পশুর বিশ্বাসঘাতকতা বিষয়টি পুরাণে বিশেষ ইঙ্গিত বহন করে। রূপকথার এ ধরনের গল্পগুলোতে পুরাণের প্রভাব সুস্পষ্ট।

পার্থক্য : রূপকথার গল্পে এ বিশ্বাসঘাতকতা যতটা আকর্ষণীয় হয়েছে ততটা প্রভাব মানুষের মনে ফেলতে পারে নি, কারণ এটি লঘু ভাবের। কিন্তু মিথ মানুষের মনে প্রভাব ফেলেছে। মিথ-এ বিশ্বাসঘাতকের হত্যা দেখানো হলেও রূপকথাতে তা দেখানো হয় নি।

পুরাণে কাহিনী বর্ণনার পাশাপাশি নীতিশিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য থাকে। নিছক মনোরঞ্জনের জন্যে এগুলো বলা হয় না। তবে রূপকথাতে রূপকের মাধ্যমে নীতিকথা জানানোর উদ্দেশ্য থাকলেও মানুষের মনোরঞ্জনই এর মূল উদ্দেশ্য। এজন্যে এই বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মানুষের ইন্দ্রসভায় গমন

মানুষের ইন্দ্রলোকে গমন রূপকথায় বর্ণিত এই বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবেই মিথ-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। মিথে সশরীরে স্বর্গ গমন বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে স্থান লাভ করেছে।

মহাভারতের বনপর্বে ইন্দ্রের ইচ্ছায় অর্জুন ইন্দ্রলোকে গমন করেন। ইন্দ্রের কথা মতো তাঁর সারথী মাতলি দিব্যরথে করে অর্জুনকে স্বর্গে নিয়ে যান *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ১৬১]*—

> সেই আশ্চর্য রথ আকাশে উঠে মানুষের অদৃশ্য লোকে এল, যেখানে চন্দ্র সূর্য বা অগ্নির আলোক নেই। পৃথিবী থেকে যে দ্যুতিমান তারকাসমূহ দেখা যায় সে সকল অতিবৃহৎ হ'লেও দূরত্বের জন্য দীপের ন্যায় ক্ষুদ্র বোধ হয়। অর্জুন সেইসকল তারকাকে স্বস্থানে স্বতেজে দীপ্তিমান দেখলেন। মাতলি বললেন, পার্থ, ভূতল থেকে যাঁদের তারকারূপে দেখছ সেই পুণ্যবানরা এখানে স্বস্থানে অবস্থান করছেন।
>
> অর্জুন অমরাবতীতে এলে দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ হৃষ্ট হয়ে তাঁর সংবর্ধনা করলেন। তিনি নতমস্তকে প্রণাম করলে ইন্দ্র তাঁকে কোলে নিয়ে নিজের সিংহাসনে বসালেন। তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ গাইতে লাগলেন, ঘৃতাচী মেনকা রম্ভা উর্বশী প্রভৃতি হাবভাবময়ী মনোহারিণী অপ্সরারা নাচতে লাগলেন।

'মানুষের ইন্দ্রসভায় গমন' পুরাণে উল্লেখিত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বাংলা রূপকথার বিভিন্ন কাহিনীতেও প্রবেশ করেছে নিজস্ব ভঙ্গিতে। বাংলা রূপকথায় মানুষের ইন্দ্রসভায় গমনের বিষয়টি কাল্পনিক হলেও কাহিনীর বিন্যাসে তা সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে। প্রসঙ্গটি রূপকথার কাহিনীতে একটা ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। ফলে রূপকথার গল্পগুলো আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

'কাঞ্চনমালা' গল্পে কাঞ্চনের সাত বোন স্বর্গের অপ্সরী। তারা স্বর্গে নৃত্য করে। কাঞ্চনের স্বামী সওদাগর রূপলাল। রাতের বেলায় কাঞ্চন কী করে তা জানার জন্যে একদিন সে ঘুমানোর ভান করে থাকে। মধ্যরাতে কাঞ্চন স্বামীকে ডেকে উত্তর না পেয়ে তার পায়ে প্রণাম করে স্বর্গের রথে ওঠে। সওদাগর তখন কাঞ্চনের পিছু পিছু গিয়ে স্বর্গের রথ দেখতে পায়। সে গোপনে রথের চাকা ধরে থাকে। রথ স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় পৌঁছালে কাঞ্চনের বোনেরা কাঞ্চনকে সাদরে নিয়ে যায়। আর তার স্বামী রূপলাল আড়াল থেকে দেখতে পায় ইন্দ্রের সভা নাচ-গানে গম্‌গম্ করেছে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৪২৪]* —

> তাড়াতাড়ি চুপে চুপে পিছন দিয়া গিয়া আপন চাদরে কোমরের সঙ্গে আর চাকার সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দুই হাতে সওদাগর রথের চাকা ধরিয়া রহিলেন। স্বর্গের রথ স্বর্গে উঠিয়া গেল।
>
> নিমিষে রথ ইন্দ্রসভার দুয়ারে গিয়া থামিল। অমনি সাত বোন অপ্সরী কিন্নরা কিন্নরী সারি দিয়া আসিয়া কাঞ্চনকে নিয়া গেল। ইন্দ্রের ইন্দ্রপুরীর সভা, ভরা আসর, নাচে গানে গম্ গম্। কাঞ্চন, হাতে চামর নিয়া, দণ্ডবৎ করিয়া, সোনার-চরণ পায়ে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব : মানুষের পক্ষে জীবিত অবস্থায় স্বর্গে গমন এমন ধারণা পুরাণাশ্রিত। রূপকথায় মানুষের সশরীরে স্বর্গ গমন বিষয়টি পুরাণ থেকে এসেছে।

পার্থক্য : মূল বিষয় একই হলেও কাহিনীর বিন্যাসে এখানে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। অর্জুন দেবতুল্য। ইন্দ্রের আমন্ত্রণেই সে স্বর্গে গমন করে। আর রূপকথার রূপলাল সাধারণ মানুষ হয়ে লুকিয়ে স্বর্গে গমন করে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. রক্তস্নানের প্রতিজ্ঞা

'রক্তস্নানের প্রতিজ্ঞা' বাংলা রূপকথায় উল্লেখিত এ বিষয়টি পুরাণ প্রভাবিত। পুরাণে এই প্রতিজ্ঞা প্রচণ্ড ক্রোধের বশে করা হলেও তা গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে পৌরাণিক যুগের মানুষের মনোভাবের স্পষ্ট অভিব্যক্তি এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

মহাভারতের আদিপর্বে পাশাখেলায় হেরে গিয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর রাজ্য ও সম্পদ দিয়ে দেয়া ছাড়াও বারো বছরের বনবাসের কথাও স্বীকার করেন। কিন্তু দুর্মতি দুঃশাসন পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো কাপুরুষের কাজ করে। শ্রী হরির কৃপায় দ্রৌপদী তার লজ্জা নিরাবণ করতে সক্ষম হন। এই কাজে ভীম ভীষণ রেগে গিয়ে দুঃশাসনের রক্ত পান করার প্রতিজ্ঞা করেন *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭; ১৩৪]*—

> ক্রোধে হস্ত নিষ্পিষ্ট ক'রে কম্পিত ওষ্ঠে ভীম উচ্চস্বরে বললেন, ক্ষত্রিয়-গণ, শোন, যদি আমি যুদ্ধক্ষেত্রে এই পাপী দুর্বুদ্ধি ভরতকুলকলঙ্ক দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে রক্তপান না করি, তবে যেন পিতৃপুরুষগণের গতি না পাই।

মিথ-এ উল্লেখিত রক্ত পাবার প্রতিজ্ঞা প্রসঙ্গটি বাংলা রূপকথায় বিভিন্ন কাহিনীতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। বাংলা রূপকথার যেসব গল্পে রাজা-রানি ও রাক্ষস-রাক্ষসীর মধ্যে বিবাদ দেখানো হয়েছে সেসব গল্পে রক্ত পাবার প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয়েছে।

'শীত-বসন্ত' গল্পে এক রাজার দুই রানি– সুয়োরাণী ও দুয়োরাণী। দুয়োরাণীর দুই ছেলে – শীত ও বসন্ত। সুয়োরাণী ছলনা করে দুয়োরাণীকে টিয়া করে দেয় । তারপর সৎমা সুয়োরাণী চালাতে থাকে শীত ও বসন্তের ওপর নির্মম নির্যাতন। একদিন সুয়োরাণী শীত-বসন্তকে গাল-মন্দ করে, আসবাবপত্র ভেঙে ফেলে। এমনকী নিজের গায়ের অলংকার পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলে। খবর পেয়ে রাজা এসবের কারণ জানতে চাইলে সুয়োরাণী সতীনের ছেলের রক্তে স্নান করার ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। তখনই রাজা অবিবেচকের মতো জল্লাদকে শীত-বসন্তকে হত্যা করে রক্ত এনে দিতে বলে। পরে অবশ্য জল্লাদের দয়ায় শীত-বসন্ত জীবনে বেঁচে যায় *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৩৭]* —

> রাণী বলিল্– "কি! সতীনের ছেলে, সেই আমাকে গা'লমন্দ দিল। শীত-বসন্তের রক্ত নহিলে আমি নাইব না।"

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব : দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও ভীমের রক্তপানের প্রতিজ্ঞা পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা রূপকথায় প্রতিশোধের বশে মানুষের রক্ত পাবার প্রতিজ্ঞার ওপর এর প্রভাব দেখা যায়।

পার্থক্য : রূপকথার কাহিনীতে রানি রাক্ষসী হলেও রাজার সামনে তা প্রকাশ করতে চায় নি। সে রক্ত পান না করে রক্তে স্নান করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভীম নিজ স্ত্রীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে এ ধরনের প্রতিজ্ঞা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬. বনবাস

'বনবাস' প্রসঙ্গটি পুরাণের বিভিন্ন আখ্যান ও উপাখ্যানে আলোচিত হয়েছে গুরুত্ব সহকারে। মিথ-এর কাহিনীতে বনবাস প্রসঙ্গটি অনেকাংশেই নতুন মাত্রা যোগ করে কাহিনীকে নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে সহায়তা করেছে। বনবাস-ই যেন পরিচালিত করেছে মিথকে ।

মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠির এবং কৌরবদের পক্ষে শকুনির মধ্যে পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির তাঁর রাজত্ব হারায়। কৌরবরা রাজ্য পেয়েও সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তারা আবারও যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়। যুধিষ্ঠির দূতসভায় উপস্থিত হলে শুকনি হার-জিতের শর্ত বেঁধে দেয়। শর্তানুযায়ী যে পক্ষ হারবে তারা হরিণের চামড়া পরিধান করে বারো বছরের জন্যে বনবাস ও এক বছরের জন্যে অজ্ঞাতবাস করবে। শর্ত মেনে খেলতে গিয়ে আবারও কৌরবদের কাছে যুধিষ্ঠির হেরে যায়। ফলে তাদের বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাত বাস করতে হয় *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ১৩৭]* —

> আমরা যদি হারি তবে মৃগচর্ম পরিধান ক'রে দ্বাদশ বর্ষ মহারণ্যে বাস করব, তার পর এক বৎসর স্বজনবর্গের অজ্ঞাত হয়ে থাকব। যদি অজ্ঞাতবাসকালে কেউ আমাদের সন্ধান পায় তবে আবার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করব। যদি তোমরা হেরে যাও তবে তোমরাও এই নিয়মে বনবাস ও অজ্ঞাতবাস করবে, এবং ত্রয়োদশ বৎসরের শেষে স্বরাজ্য পাবে। এখন খেলবে এস।
>
> সভাস্থ সকলে উদ্‌বিগ্ন হয়ে হাত তুলে বললেন, আত্মীয়দের ধিক, তাঁরা পাণ্ডবদের সাবধান ক'রে দিচ্ছেন না, পাণ্ডবরাও তাঁদের বিপদ বুঝছেন না। যুধিষ্ঠির বললেন, আমি স্বধর্মনিষ্ঠ, দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হ'লে নিবৃত্ত হই না। শকুনি, আমি আপনার সঙ্গে খেলব। শকুনি তাঁর পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি।
>
> পরাজিত পাণ্ডবগণ মৃগচর্মের উত্তরীয় ধারণ ক'রে বনবাসের জন্য প্রস্তুত হলেন।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে রাজা দশরথ রামের রাজাভিষেক করতে চাইলে সমস্ত অযোধ্যায় আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। কিন্তু দশরথের মেঝ রানি কৈকয়ী তার ভৃত্য মন্থরার প্ররোচনায় ভরতকে রাজা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

কৈকয়ীর পূর্ব থেকে রাজা দশরথের কাছে দুটি বর পাওনা ছিল। তিনি রাজা দশরথের কাছে প্রথম বরে ভরতকে রাজা ও দ্বিতীয় বরে রামের চৌদ্দ বছরের বনবাসের প্রস্তাব করেন। দশরথ অন্য বর চাইতে বললেও কৈকয়ী তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তখন পিতৃ প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যে রাম চৌদ্দ বছরের জন্যে বনবাসে যান। রাম যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গী হিসেবে সীতা ও লক্ষ্মণ বনবাসে যান *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ১৯৮-১৯৯]* —

Dhaka University Institutional Repository

অনন্তর রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ দশরথের চরণে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শোকসন্তপ্তমনে জননীকে অভিবাদন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সর্বাগ্রে কৌশল্যা, তৎপরে সুমিত্রাকে প্রণাম করিলে, সুমিত্রা তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্বক হিতাভিলাষে কহিলেন, বৎস! যদিও সকলে প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইঁহার সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি। বাছা! জ্যেষ্ঠের বশবর্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার জানিবে। বিশেষতঃ এইরূপ কার্য এই বংশের যোগ্য; দান যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমরে দেহত্যাগ এই সমস্ত কার্য এই বংশেরই সমুচিত। এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে জননী এবং গহন কাননকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও। সুমিত্রা প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনঃপুন কহিতে লাগিলেন, বাছা! তবে তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর।

অন্তর সুমন্ত্র বিনীতভাবে রামকে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে রথে আরোহণ করো। তুমি যে স্থানে বলিবে শীঘ্রই তথায় লইয়া যাবই। দেবী কৈকেয়ী অদ্য তোমাকে গমনের আদেশ দিয়াছেন, সুতরাং আজ হইতেই চতুর্দশ বৎসর বনবাসকালের আরম্ভ করিতে হইতেছে।

'বনবাস' পুরাণে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি বাংলা রূপকথার বিভিন্ন গল্পে বহুভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা রূপকথায় বনবাস প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হওয়ার পাশাপাশি কাহিনীতে নতুন দিক তৈরির সুযোগ করে দিয়েছে।

'মালঞ্চমালা' গল্পে নিঃসন্তান রাজার ছেলে হলে তার আয়ু নির্ধারিত হয় মাত্র বারো দিন। সন্তানের আয়ু মাত্র বারো দিন জেনে রাজা আর্তনাদ করেন। রাজা-রানি দেবতাদের কাছে সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনা করেন। তখন দেবতারা ব্রাহ্মণের বেশে রাজপুত্রকে দেখে বলেন, যদি বারো বছরের কোনো কন্যার সাথে এই ছেলের বিয়ে দাও তবে ছেলের আয়ু বাড়বে। রাজা অনেক চেষ্টার পরেও বারো বছরের কোনো রাজকন্যার খোঁজ না পেয়ে কোটালের মেয়ের সাথে রাজপুত্রের বিয়ে দেন। কিন্তু বাসর রাতে রাজপুত্র মারা যায়। তখন রাজা কোটালকে হত্যা করেন, কোটাল কন্যাকে বিভিন্ন রকম নির্যাতন করে বনবাসে পাঠান *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৩৩৭]* —

তা'র আগেই কোটাল-কন্যার দুই চোক উপড়াইয়া লোহার শলার আগুনে পোড়াইলেন। – দর দর রক্ত পড়ে! – কোটালকন্যাকে বনবাসে নিয়া যায়!!

প্রভাব : শাস্তি হিসেবে বনবাস পৌরাণিক। রূপকথায় যে কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে তাতে দৈবিক ক্ষমতাও কাজ করেছে। তাই রূপকথার এ প্রসঙ্গটিতে পুরাণের প্রভাব স্বীকৃত।

পার্থক্য : পুরাণে বনবাসের কারণ হিসেবে পাশাখেলায় পণ-প্রথা ও রাজ্য সম্পদের লোভ থাকলেও রূপকথায় শুধু সন্তানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার বিষয়টি স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. পাতালপুরী

'পাতালপুরী' রূপকথায় বর্ণিত এ প্রসঙ্গটি মিথ-এর সাথে সম্পর্কিত। পাতালপুরী তথা নাগলোকে গমন পুরাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মহাভারতের আদিপর্বে ভীমের বীরত্বের কথা উল্লেখ করা আছে। সে ছিল সহজাত বীর। ফলে কৌরবরা ছোটকাল থেকেই ভীমের ওপর রাগান্বিত। একদিন দুর্যোধন বিশ্বাসঘাতকতা করে ভীমকে ভালো ফলের নামে বিষাক্ত কালকুট ফল খাইয়ে দেন। বিষের প্রভাবে ভীম গঙ্গাতীরে অচেতন হয়ে পড়ে। তখন দুর্যোধন লতা দিয়ে ভীমসেনকে জড়িয়ে নদীতে ফেলে দেন। ডুবতে ডুবতে ভীম নাগলোকে হাজির হন। তখন বিভিন্ন বিষাক্ত সাপের দংশনে কালকুটের বিষ নষ্ট হয়, ভীম জ্ঞান ফিরে পান। চেতনা ফিরে পেয়ে ভীম সাপদের হত্যা করতে থাকেন। সাপেরা বাসুকির কাছে এ খবর দিলে তিনি ভীমকে নিজের দৌহিত্রের দৌহিত্র বলে চিনতে পারেন এবং তার সঙ্গে গভীর আলিঙ্গান করেন *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ৫২]*—

> জলক্রীড়ার পর সকলে বিহারগৃহে বিশ্রাম করতে গেলেন, কিন্তু ভীম অত্যন্ত শ্রান্ত এবং বিষের প্রভাবে অচেতন হয়ে গঙ্গাতীরে প'ড়ে রইলেন, দুর্যোধন তাঁকে লতা দিয়ে বেঁধে জলে ফেলে দিলেন।
>
> সংজ্ঞাহীন ভীম জলে নিমগ্ন হয়ে নাগলোকে উপস্থিত হলেন।

'পাতালপুরী' এই অলৌকিক ও পুরাণাশ্রিত বিষয়টি বাংলা রূপকথার বিভিন্ন গল্পে বর্ণিত হয়েছে। বাংলা রূপকথার যেসব গল্পে সাধারণত রাজপুত্রদের রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী আলোচিত হয়েছে তাতে পাতালপুরী ভাবনা বিশেষ গুরুত্বের সাথে স্থান লাভ করেছে।

'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে ন-রানির সন্তান ভুতুম আর ছোট রানির সন্তান বুদ্ধু। রাজার অন্য রানিদের পাঁচ পুত্র কলাবতী রাজকন্যার দেশে যেতে গিয়ে নদীতে ডুবে যায়। তাদের পিছনে সুপারীর ডোঙাতে করে যাচ্ছিল ভুতুম ও বুদ্ধু। যেখানে রাজপুত্রদের নৌকা ডুবে যায় সেখানে এসে বুদ্ধুর মন কেমন করে ওঠে। বুদ্ধু ভুতুমকে জলে ডুব দিতে বললে ভুতুম অসম্মতি জানায়। তখন বুদ্ধু রাজপুত্রদের খোঁজে জলে ডুব দিয়ে যেতে যেতে পাতালপুরীতে পৌঁছায় *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ১৩]*—

> যাইতে যাইতে বুদ্ধু পাতাল-পুরীতে গিয়া দেখিল, এক মস্ত সুড়ঙ্গ। বুদ্ধু সুড়ঙ্গ দিয়া, নামিল।

'পাতাল-কন্যা মণিমালা' গল্পে রাজার পুত্র ও মন্ত্রির পুত্র দুই বন্ধু। তারা একবার দেশ ভ্রমণে যায়। সন্ধ্যার সময় তারা বিপদের ভয়ে তাদের ঘোড়া দুটি বেঁধে রেখে একটি উঁচু গাছের মগডালে বিশ্রাম নেয়। অনেক রাত্রে ভয়ংকর শব্দ শুনে তাদের ঘুম ভেঙে যায়। তারা দেখতে পায় এক বিশাল অজগর তাদের ঘোড়া দুটি খেয়ে ফেলছে। তারা অজগরের পাশে সাত রাজার ধন সাপের মণি দেখতে পায়। মন্ত্রিপুত্র গাছ থেকে নেমে

Dhaka University Institutional Repository

সেই মণির ওপর কাদা দিয়ে ঢেকে দেয় এবং নিজের তলোয়ারটি কাদার ওপর উল্টিয়ে রাখে। সাপ মণি না পেয়ে সেই তলোয়ারে ছোবল মারে। ফলে সাপ প্রথমে রক্তাক্ত হয় শেষে পাগল হয়ে যায়। সব শেষে সাপ রাগে নিজের গায়ে ছোবল মারতে মারতে নিহত হয়। পর দিন সকাল বেলা রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র মণি ধুতে জলে নামলে জল শুকাতে শুকাতে তারা দু জন পাতালে গিয়ে পৌঁছায় *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৮৯]* —

> নামিতে, নামিতে, দুই বন্ধু যতদূর যান, –জল কেবল দুই ভাগ হইয়া শুকাইয়া যায়। শেষে- মণির আলোতে দেখেন, পাতালপুরী পর্যন্ত এক পথ, দুইজনে চলিতে লাগিলেন।

'শঙ্খমালা' গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্র অসহায় শক্তির বনের ভেতরে সোনার রাজপুত্রের মতো একটি ছেলে হয়। সন্তান হলে শক্তি যে কুঁড়েঘরে ছিল তার পাশে মণি-মুক্তায় ঢেকে যায়। তা দেখে দাই কাঠুরাণীর ষড়যন্ত্রে সাতাশ চোর শক্তির পুত্রকে চুরি করে। শক্তির বাচ্চা চুরি করার সময় শক্তি ঘুমিয়ে ছিল। ঘুম থেকে উঠে শক্তি তার বাচ্চাকে খুঁজতে থাকে। সব জায়গা ঘুরে বাচ্চা না পেয়ে শক্তি সমুদ্র পাড়ে পৌঁছায়। নিজের সন্তানকে না পেয়ে শক্তি সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়। তখন সাগরকন্যা বুক পেতে দেয় এবং হাজার শঙ্খে আরতি করে শক্তিকে পাতালপুরীতে নেয় *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৪৫৫-৪৫৬]* —

> সেই দিন সমুদ্রের জলে তোলপাড় উঠিল।
>
> সেই যে শক্তি সমুদ্রে পড়িয়াছিলেন? – পড়িতেই, সেদিন, –
>
> সাগর রাণীর সাগর কন্যা, বুক পতিয়া দিল,
>
> – শক্তিরে, –
>
> হাজার শঙ্খে আরতি দিয়া, পাতালপুরে নিল।
>
> বারো বারো বৎসর শক্তিসুন্দর পাতালপুরীতে, সন্ধ্যার ফুলের মত মূর্ছার ঘোরে।
>
> অচেতন হইয়া রহিলেন; যত শঙ্খকন্যা তাঁর চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া রহিল।

প্রভাব : নাগলোক তথা পাতালপুরীর ভাবনা এসেছে পুরাণ থেকে। তাই রূপকথার কাহিনীতে যে পাতালপুরী প্রসঙ্গটি এসেছে তা পুরাণ প্রভাবিত।

পার্থক্য : পাতালপুরী তথা নাগলোক বিষয়টিতে রূপকথা ও মিথ-এর ভেতরে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। শুধু কাহিনীর বিন্যাসে পার্থক্য দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৮. মানুষের রাক্ষস বধ

'মানুষের রাক্ষস বধ' বাংলা রূপকথার এ প্রসঙ্গটি পুরাণ প্রভাবিত। পুরাণের প্রায় প্রত্যেক বড় বীর রাক্ষস বধ করেছেন। পুরাণে রাক্ষস বধের মধ্য দিয়ে তাদের বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

মহাভারতের আদিপর্বে হিড়িম্বর বোন হিড়িম্বা ভীমসেনকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন হিড়িম্ব ভীমসেনসহ পঞ্চপাণ্ডবদের হত্যা করতে উদ্যত হয়। ফলে ভীমসেন ও হিড়িম্বর মধ্যে একটা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাতের বেলায় যুদ্ধ হচ্ছিল। ঊষাকালে রাক্ষসরা বেশী হিংস্র হয় তাই যুধিষ্ঠির দ্রুত রাক্ষসটিকে মেরে ফেলার জন্যে ভীমকে বলেন। ভীম তখন হিড়িম্বকে ওপরে তুলে ধরে ঘোরাতে থাকেন, তারপর মাটিতে ফেলে চেপে তাকে মেরে ফেলেন *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ৬৭]*—

> ঊষাকাল আসন্ন, সেই রৌদ্র মুহূর্তে রাক্ষসরা প্রবল হয়। এই রাক্ষসটাকে নিয়ে খেলা করবেন না, ওকে শীঘ্র মেরে ফেলুন। তখন ভীম হিড়িম্বকে তুলে ধ'রে ঘোরাতে লাগলেন এবং তার পর ভূমিতে ফেলে নিষ্পিষ্ট ক'রে বধ করলেন।

এছাড়াও আদিপর্বে এক ব্রাহ্মণ কুন্তীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে রাক্ষস বকাসুরের কথা বলেন। সেই রাক্ষসের প্রতিদিনের খাদ্য হচ্ছে প্রচুর অন্ন, দুটি মহিষ ও একজন মানুষ। সেদিন ঐ ব্রাহ্মণের পালা ছিল। তখন কুন্তী তাকে বললেন, আমার পাঁচ ছেলের একজন রাক্ষসের কাছে যাবে, আপনার চিন্তা করার দরকার নেই। এরপর কুন্তী ভীমকে অন্ন ও মহিষসহ সেই বক রাক্ষসের কাছে পাঠালেন। ভীম সেখানে গিয়ে রাক্ষসের অন্ন খেতে লাগলেন। তা দেখে রাক্ষস রেগে গিয়ে ভীমকে আক্রমণ করে। ভীমের সাথে তার বাহুযুদ্ধ হয়। ভীম বীরত্বের সাথে বক রাক্ষসকে পরাজিত ও হত্যা করেন *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭:৭০-৭১]*—

> রাক্ষস দুই হাত দিয়ে ভীমের পিঠে আঘাত করলে, কিন্তু ভীম গ্রাহ্য করলেন না। রাক্ষস একটা গাছ নিয়ে আক্রমণ করতে এল। ভীম ভোজন শেষ করে আচমন ক'রে বাঁ হাতে রাক্ষসের নিক্ষিপ্ত গাছ ধ'রে ফেললেন। তখন দুজনে বাহুযুদ্ধ হ'তে লাগল, ভীম বক রাক্ষসকে ভূমিতে ফেলে নিষ্পিষ্ট ক'রে বধ করলেন।

'মানুষের রাক্ষস বধ' পুরাণে উল্লেখিত এই বিষয়টি বাংলা রূপকথার বিভিন্ন কাহিনীতে স্থান লাভ করেছে। রূপকথায় রাজা-রানি ও রাক্ষসের বিরোধ নিয়ে যেসব গল্প প্রচলিত আছে তাতে মানুষের হাতে রাক্ষস বধ এর ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে।

'নীলকমল আর লালকমল' গল্পে নীলকমল ও লালকমল দুই ভাই। তারা খোক্ষস মারার জন্যে কঠুরীতে গিয়ে তলোয়ার খুলে বসে থাকে। মাঝ রাতে তাদের ঘুম এলে নীলকমল ঘুমিয়ে পড়ে। লালকমল জেগে

Dhaka University Institutional Repository

থাকা অবস্থায় শেষ রাতে রাক্ষসেরা আসে। রাক্ষসেরা কে জেগে আছে জানতে চাইলে নীলকমলের কথা মতো লালকমল বলে, নীলকমল। ভয়ে রাক্ষসেরা পিছিয়ে যায়। রাক্ষসেরা লালকমলের নখের ডগা, জীভ ও থুথু দেখতে চাইলে লালকমল বুদ্ধিমত্তার সাথে রাক্ষসদের পরাস্ত করে। কিছু পরে আবার রাক্ষসেরা এসে কে জাগে জানতে চাইলে, নীলকমল ভুল করে বলে লালকমল। এ কথা শুনেই লালকমলের ওপর রাক্ষসেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিপদে পড়ে লালকমল নীলকমলকে ডাকে। ঘুম থেকে উঠে নীলকমল খোক্ষসদের মারতে শুরু করে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৭২]*—

> নীলকমলের সাড়ায় আ-খোক্কস ছা-খোক্কস সকল খোক্কস আধমরা হইয়া গেল। নীলকমল উঠিয়া ঘিয়ের দীপ জ্বালিয়া দিয়া সব খোক্কস কাটিয়া ফেলিলেন। সকলের বড় খোক্কসটা নীলকমলের হাতে পড়িয়া, যেন, গিরগিটীর ছা!

প্রভাব : মানুষের হাতে রাক্ষস বধ এটি পুরাণের খুবই প্রচলিত একটি বিষয়। রামায়ণ ও মহাভারত-এর প্রায় প্রত্যেক পুরাণের বিভিন্ন আখ্যানে ও উপাখ্যানে মানুষের হাতে রাক্ষস নিহত হয়েছে। রূপকথায় মানুষের হাতে রাক্ষসের বধ বিষয়টিতে পুরাণের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়।

পার্থক্য : পুরাণে রাক্ষসের হত্যার কথা বলা হলেও রূপকথায় রাক্ষস ও খোক্ষসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাক্ষস ও খোক্ষস একই অপশক্তির প্রতীক। শুধু কাহিনীর ভিন্নতার ও বিশিষ্ট কথনভঙ্গির জন্যে এ ধরনের পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. অন্যায় করার ফলে / অভিশাপে সাপ হয়ে যাওয়া

'অন্যায় করার ফলে / অভিশাপে সাপ হয়ে যাওয়া' রূপকথায় উল্লেখিত এ বিষয়টি পুরাণে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। পুরাণে ধার্মিক মানুষের হাতে পাপীদের উদ্ধার হয়ে যাওয়ার বিষয় নিয়ে সে সব আখ্যান রয়েছে তাতে এ ধরনের ঘটনা আলাদা মাত্রা যোগ করেছে।

মহাভারতের বনপর্বে ভীম মৃগয়ায় গিয়ে বিভিন্ন পশু শিকার করে ফেরার পথে এক অজগর দ্বারা আক্রান্ত হন। সর্পরূপী নহুষ তাকে বেষ্টন করে ফেলেন। যুধিষ্ঠির ভীম কোথায় জিজ্ঞাসা করলে দ্রৌপদী বলেন, তিনি অনেকক্ষণ আগে মৃগয়ায় গেলেও এখনও ফেরেন নি। তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে খুঁজতে গিয়ে বনের মধ্যে গিয়ে ভীমকে সাপ দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় দেখতে পান। যুধিষ্ঠির-এর বুদ্ধিমত্তা ও ধর্মজ্ঞান দেখে সাপ ভীমকে ছেড়ে দেন এবং যুধিষ্ঠিরের উপস্থিতিতে সাপ রূপ থেকে মানুষ রূপ ধারণ করেন *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ২১৫]* —

> সর্পরূপী নহুষ বললেন, আমি দেবলোকে অভিমানে মত্ত হয়ে বিমানে বিচরণ করতাম, ব্রহ্মর্ষি দেবতা গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলেই আমাকে কর দিতেন। এক সহস্র ব্রহ্মর্ষি আমার শিবিকা বহন করতেন। একদিন অগস্ত্য যখন আমার বাহন ছিলেন তখন আমি পা দিয়ে তাঁর মস্তক স্পর্শ করি। তাঁর অভিশাপে আমি সর্প হয়ে অধোমুখে পতিত হলাম। আমার প্রার্থনায় তিনি বললেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে শাপমুক্ত করবেন। এই কথা বলে নহুষ অজগরের রূপ ত্যাগ ক'রে দিব্যদেহে স্বর্গারোহণ করলেন।

'অন্যায় করার ফলে / অভিশাপে অজগর হয়ে যাওয়া' পুরাণে উল্লেখিত এ প্রসঙ্গটি বাংলা রূপকথার নানা কাহিনীতে নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। বাংলা রূপকথার যে গল্পে মানুষ, রাক্ষস-এর পাশাপাশি দেবতাদের প্রসঙ্গ আছে সেখানে অন্যায় করার ফলে বা অভিশাপে অজগর হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

'পুষ্পমালা' গল্পে নিঃসন্তান রানি ও কোটালিনী স্নান করার সময় শপথ করে– যদি তাদের একজনের ছেলে ও আরেকজনের মেয়ে হয়ে তবে তাদের বিয়ে দেবে। কোটালিনীর পুত্র ও রানির মেয়ে হলে রানি তার কথা রাখে নি। কোটাল ও কোটালিনীর সাথে অন্যায় করার ফলে রানি অজগরে পরিণত হয়। পরে রাজকন্যা পুষ্পমালার সংস্পর্শে শক্ত হয়ে রানি মানুষ মূর্তি ধারণ করে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৩৬৩]* —

> হুঙ্কার ছাড়িয়া কন্যা, শাণ তরোয়াল শঙ্খিনীর ফণার চক্রে বসাইয়া দিলেন।
> উথাল পাথার করিয়া অজগর, – ওমা! একি- অর্ধেক সাপ, অর্ধেক খানা সেই – মালিনী!!
> মালিনী বলিল, –"পুরুষ বেশে কোন্ সতী, কে আমায় পাপের জন্যে মুক্তি দিলে?
> কন্যা দাঁড়াইলেন! – "মালিনী! তুমি কে।"

Dhaka University Institutional Repository

মালিনী কাঁদিয়া উঠিল, – "মা'ঃ।
আপনি তিন সত্য করিলাম, আপন সত্য ভেঙ্গেছিলাম কোটালিনীর সাথে! মালিনী হইয়া জন্ম নিলাম, সাপ হইয়া রাজ্য খেলাম; আজ মুক্ত তোমার হাতে।"

প্রভাব : অভিশাপের ফলে অজগর হয়ে যাওয়া ও পরে ধার্মিক মানুষের সংস্পর্শে মানুষ রূপ ফিরে পাওয়া পৌরাণিক এই বিষয়টি রূপকথাতেও একইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রূপকথায় মিথ-এর প্রভাব প্রত্যক্ষ।

পার্থক্য : মূল বিষয়ে কোনোরকম ভিন্নতা নেই, শুধু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ও রচনাশৈলীর ভিন্নতার কারণে কাহিনীর বিন্যাসে পার্থক্য দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১০. সোনার পদ্ম

বাংলা রূপকথায় বর্ণিত 'সোনার পদ্ম' প্রসঙ্গটি মিথ প্রভাবিত। রূপকথার ন্যায় পুরাণেও সোনার পদ্মের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাভারতের বনপর্বে দ্রৌপদীর অনুরোধে ভীম সোনার পদ্ম সংগ্রহে যান। ভীম স্বর্গ দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছে দেখে হনুমান তার পথ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন। সেখানে হনুমানের সাথে ভীম বল প্রয়োগে ব্যর্থ হয়ে হনুমান প্রদর্শিত পথে কুবেরের পদ্মবনে প্রবেশ করেন। ধনরাজ কুবেরের পদ্মবনের রক্ষীরা ভীমকে বাধা দিলে ভীম তাদের পরাজিত ও হত্যা করে সোনার পদ্ম আহরণ করেন। কুবেরের সৈন্যরা কুবেরকে সব অভিহিত করেন। পরাজিত রাক্ষসদের কাছে সমস্ত কথা শুনে কুবের হেসে বললেন, আমি সব জানি, কৃষ্ণার (দ্রৌপদী) জন্যে ভীম ইচ্ছামত পদ্ম নিক *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ২০৬]*—

> দিনশেষে তিনি বনমধ্যে হংস কারণ্ডব ও চক্রবাকে সমাকীর্ণ একটি বৃহৎ নদী দেখতে পেলেন, তার জল অতি নির্মল এবং পরম সুন্দর স্বর্ণময় দিব্য পদ্মে আচ্ছন্ন।

'সোনার পদ্ম' পুরাণে উল্লেখিত এই বিষয়টি বাংলা রূপকথার কাহিনীতেও উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা রূপকথায় রাজপুত্রের দুঃসাহসিক অভিযান নিয়ে যেসব কাহিনী আছে তাতে কাহিনীর অনুষঙ্গ এবং রাজকন্যার অলংকারের উপকরণ হিসেবে সোনার পদ্মের উল্লেখ পাওয়া যায়।

'ঘুমন্ত পুরী' গল্পে রাজপুত্র একাকি দেশভ্রমণে যান। ঘুরতে ঘুরতে তিনি বনের ভেতরে এক রাজপুরী আবিষ্কার করেন। রাজপুরীতে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য থাকলেও সে রাজ্যের সকল মানুষ ঘুমন্ত। রাজকুমার রাজপ্রাসাদে ঘুরতে ঘুরতে একসময় ফুলের গন্ধ পান। তিনি দেখেন, জল নেই তবুও লাখ লাখ পদ্ম ফুটে আছে। রাজপুত্র দেখতে পান হীরার নালে যে সোনার পদ্ম আছে তাতে এক সুন্দরী রাজকন্যা ঘুমে বিভোর হয়ে আছে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ২২-২৩]*—

> ফুলবনের কাছে গিয়া রাজপুত্র দেখেন, ফুলের বনে সোনার খাট, সোনার খাটে হীরার ডাঁট, হীরার ডাঁটে ফুলের মালা দোলান রহিয়াছে; সেই মালার নীচে, হীরার নালে সোনার পদ্ম, সোনার পদ্মে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা বিভোরে ঘুমাইতেছেন।

প্রভাব : রূপকথা এবং পুরাণে যে সোনার পদ্মের উল্লেখ আছে।

পার্থক্য : রূপকথার সোনার পদ্মের সাথে যেসব অনুষঙ্গ যুক্ত আছে তার সঙ্গে পুরাণের কোনো মিল নেই। পুরাণের পদ্ম তোলায় বিশেষ উদ্দেশ্য থাকলেও রূপকথাতে সোনার পদ্ম তোলার দৃষ্টান্ত নেই। রূপকথাতে সোনার পদ্ম গৌণ বিষয় হিসেবে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১১. সন্তানের আশায় শিকড় / ফল ভক্ষণ

'সন্তানের আশায় শিকড় / ফল ভক্ষণ' বাংলা রূপকথার বিভিন্ন কাহিনীতে বর্ণিত এই বিষয়টি মিথ-এর সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণ। পুরাণের মানুষেরা দেবতাদের কাছে যা কামনা করতেন তার মধ্যে সন্তান উল্লেখযোগ্য। মুনি-ঋষিদের দেয়া ফল / শিকড় ভক্ষণে সন্তান জন্মের বিষয়টি পুরাণে প্রকাশ করা হয়েছে।

মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কাছে জরাসন্ধ সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জরাসন্ধের জন্ম বৃত্তান্ত জানান। জরাসন্ধের পিতা রাজা বৃহদ্রথের ছিল দুই স্ত্রী। বৃহদ্রথের যৌবন পার হয়ে গেলেও কোনো পুত্র হয় নি। তখন চন্ডকৌশিক মুনি বৃহদ্রথকে একটি মন্ত্রসিদ্ধ আম দেন, সেই আম দুই ভাগ করে রানিরা খান। ফলে, দশ মাস পরে তাদের দুজন মানব শরীরের দুই খন্ড প্রসব করে। প্রত্যেক খন্ডের একটি হাত, একটি পা, একটি চোখ ও একটি কান ছিল। রানিরা ক্ষোভে-দুঃখে তাদের সন্তান পরিত্যাগ করেন। জরা নামে এক রাক্ষসী সেই দুই খন্ডকে যুক্ত করলে তখনই সম্পূর্ণ বীর কুমার জরাসন্ধের আবির্ভাব ঘটে। *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ১০৭]* —

> রাজার যৌবন গত হ'ল তথাপি তিনি পুত্রলাভ করলেন না। উদারচেতা চন্ডকৌশিক মুনি রাজাকে একটি মন্ত্রসিদ্ধ আম্রফল দেন, সেই ফল দুই খন্ড ক'রে দুই রাজপত্নী ফেলেন এবং গর্ভবতী হয়ে দশম মাসে দুজনে দুই শরীরখন্ড প্রসব করলেন।

'সন্তানের আশায় শিকড় / ফল ভক্ষণ' পুরাণে উল্লেখিত এই বিষয়টি বাংলা রূপকথার কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণে ফল ভক্ষণের বিষয়টি রূপকথায় শিকড় ভক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হলেও উভয়ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এক। সন্তান কামনায় শিকড় ভক্ষণ রূপকথায় পৌরাণিক ভাবকে ফুটিয়ে তুলেছে।

'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে এক রাজার সাত রানি, কিন্তু কোনো রানির সন্তান ছিল না। ফলে রাজাসহ রাজ্যের সকল প্রজার মনে ছিল দুঃখ। একদিন রানিরা নদীর ঘাটে স্নান করতে গেলে এক সন্ন্যাসী রানিদের একটি শিকড় দিয়ে বলেন, শিকড়টি বেটে খেলে তোমাদের সন্তান হবে। সন্ন্যাসীর কথা মতো সাত রানির মধ্যে পাঁচ রানি শিকড়টি বেটে খেয়ে ফেলেন। ন-রানি ও ছোট রানির জন্যে অবশিষ্ট কিছুই রাখেন না। তখন ন-রানি বাটির তলানীতে পড়ে থাকা শিকড় বাটা এবং ছোট রানি শিল-ধোয়া জলটুকু খান। দশ মাস পরে পাঁচ রানির পাঁচটি ছেলে হলেও ন-রানির পেটে পেঁচা ও ছোট রানির পেটে বানর জন্ম নেয় *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ২০০৭: ৩]* —

> একদিন রাণীরা নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন, – এমন সময়, এক সন্ন্যাসী যে, বড়রাণীর হাতে একটি গাছের শিকড় দিয়া বলিলেন, – "এইটি বাটিয়া সাত রাণীতে খাইও, সোনার চাঁদ ছেলে হইবে।"

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব : রূপকথার গল্পটিতে মিথের প্রভাব সুস্পষ্ট। উভয়ক্ষেত্রে নিঃসন্তান রাজার সন্তান কামনা পূর্ণ করার জন্যে ঋষি বা সন্ন্যাসী কর্তৃক ফল বা শিকড় দেয়া হয়। এর ফলে তাদের সন্তান হয়।

পার্থক্য : পুরাণে ফল খেয়ে সন্তান হওয়ার বিষয়টি রূপকথায় শিকড় খাবার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১২. ময়দানব প্রসঙ্গ

বাংলা রূপকথায় যে ময়দানবের কথা বলা হয়েছে মিথ-এ তার উল্লেখ আছে। মিথ-এ ময়দানব চরিত্রটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ পেয়েছে।

মহাভারতের আদিপর্বে শ্বেতকি নামক রাজা নিরন্তর যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞের কারণে বারবার ধোঁওয়া লাগায় পুরোহিতদের চোখ রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে তারা আর যজ্ঞ করতে চাইলেন না। তখন রাজা শিবের তপস্যা করার ফলে ঋষি দুর্বাসা তার যজ্ঞ করে দিলেন। সেই যজ্ঞে অগ্নিদেব বারো বছর ঘি পান করেছিলেন। তাই তার অরুচি রোগ হয়। তখন অগ্নি ব্রহ্মার কাছে প্রতিকারের উপায় জানতে চাইলে, ব্রহ্মা তাকে খাণ্ডব বন দগ্ধ করে সেখানকার প্রাণীদের মেদ খাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু ইন্দ্রের কারণে অগ্নির পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। অবশেষে তিনি কৃষ্ণ ও অর্জুনের সহায়তায় খাণ্ডব বন দগ্ধ করেন। তাতে অনেক প্রাণী নিহত হয়। এ সময় ময়দানব পালাচ্ছে দেখে অগ্নি তাকে খেতে চান। কৃষ্ণ তাকে মারার জন্যে চক্র উদ্যত করেও ময়দানবের কাতরতায় ও অর্জুনের অনুরোধে নিরস্ত হলেন *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ৯৯]* —

> এই সময়ে ময় নামক এক অসুর তক্ষকের আবাস থেকে বেগে পালাচ্ছে দেখে অগ্নি তাকে খেতে চাইলেন। কৃষ্ণ তাকে মারবার জন্য চক্র উদ্যত করলেন, কিন্তু ময়ের কাতর প্রার্থনায় এবং অর্জুনের অনুরোধে নিরস্ত হলেন।

খাণ্ডব বন দহন খণ্ডে অর্জুন ও কৃষ্ণ ময়দানবকে না মারার ফলে ময়দানব প্রত্যুপকার হিসেবে এক বিশাল সভা নির্মাণ করে দেন। ময়দানব ছিলেন অসুরদের বিশ্বকর্মা ও মহান শিল্পী *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ১০১]* —

> ঈশান কোণে যাত্রা ক'রে ময় মৈনাক পর্বতে উপস্থিত হলেন। তিনি গদা, শঙ্খ, বৃষপর্বার স্ফটিকময় সভাদ্রব্য, এবং কিংকর নামক রাক্ষসগণ কর্তৃক রক্ষিত ধনরাশি সংগ্রহ ক'রে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন এবং ভীমকে গদা আর অর্জুনকে দেবদত্ত শঙ্খ দিলেন। তার পর ময় ত্রিলোকবিখ্যাত দিব্য মণিময় সভা নির্মাণ করলেন যার দীপ্তিতে যেন সূর্যের প্রভাও পরাস্ত হ'ল। এই বিশাল সভা নবোদিত মেঘের ন্যায় আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে রইল। তার প্রাচীর ও তোরণ রত্নময়, অভ্যন্তর বহুবিধ উত্তম দ্রব্যে ও চিত্রে সজ্জিত। কিংকর নামক আট হাজার আকাশচারী মহাকায় মহাবল রাক্ষস সেই সভা রক্ষা করত। ময় দানব যেখানে একটি অতুলনীয় সরোবর রচনা করলেন, তার সোপান স্ফটিকনির্মিত, জল অতি নির্মল, বিবিধ মণিরত্নে সমাকীর্ণ এবং স্বর্ণময় পদ্ম মৎস্য ও কূর্মে শোভিত।

Dhaka University Institutional Repository

'ময়দানব' এক পৌরাণিক রাক্ষস চরিত্র। তবে সে নির্মাণ-কুশলী। পৌরাণিক এই চরিত্রটি বাংলা রূপকথায় উল্লেখিত হয়েছে। বাংলা রূপকথায় সাধারণত বিশাল ভবন ও অট্টালিকা নির্মাণ যে গল্পে স্থান পেয়েছে সেখানে ময়দানব চরিত্রটি তুলনামূলক ভবন নির্মাণ-কুশলী চরিত্র হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

'কিরণমালা' গল্পের অরুণ, বরুণ ও কিরণ এক ব্রাহ্মণের তিন সন্তান। তারা তাদের দেশের রাজাকে একদিন জল দিয়ে প্রাণে রক্ষা করে। রাজা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, তোমাদের কিছু প্রয়োজন পড়লে আমাকে জানাবে। তখন কিরণ তার দাদাদের কাছে রাজার কী থাকে জানতে চাইলে তারা বলে পুঁথিতে আছে রাজার হাতি, ঘোড়া, অট্টালিকা ইত্যাদি থাকে। এ কথা শুনে কিরণ বলে হাতি, ঘোড়া কোথায় পাই। তোমরা অট্টালিকা বানাও। বোনকে 'আচ্ছা' বলে অরুণ-বরুণ নানাবিধ দ্রব্যের সমন্বয়ে বার মাস ছত্রিশ দিনে বিশাল এক অট্টালিকা তৈরি করে। এতে ক্ষব্ধ হয়ে ময়দানব উপোস করে এবং বিশ্বকর্মা ঘর ছাড়ে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৫৫-৫৬]* —

> সে অট্টালিকা দেখিয়া ময়দানব উপোস করে, বিশ্বকর্মা ঘর ছাড়ে – অরুণ-বরুণ-কিরণের অট্টালিকা সূর্যের আসন ছোঁয়, চাঁদের আসন কাড়ে!

প্রভাব : ময়দানব পৌরাণিক চরিত্র। রূপকথায় ময়দানবের প্রসঙ্গ পুরাণ প্রভাবিত। উভয়ক্ষেত্রে ময়দানবের ভবন নির্মাণ-কুশলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পার্থক্য : পুরাণে ময়দানব সম্পর্কে বৃত্তান্ত জানা গেলেও রূপকথায় ময়দানব নামটি প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. ঐশ্বর্যমণ্ডিত সভা নির্মাণ

রূপকথায় যে 'ঐশ্বর্যমণ্ডিত সভা নির্মাণ'-এর কথা বলা হয়েছে তা পুরাণের কাহিনীর সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণ। সভা নির্মাণের বর্ণনাই পুরাণের কিছু চরিত্রের নির্মাণ কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাভারতের আদি পর্বে অগ্নি খাণ্ডব বন দগ্ধ করার সময় ময় নামে এক দানব সেখান থেকে পালাচ্ছিল। তা দেখে অগ্নি তাকে খেতে চাইলেন এবং কৃষ্ণ তাকে মারতে উদ্যত হলেন কিন্তু ময়দানবের কাতরতায় তারা ময়দানবকে মারলেন না। মহাভারতের সভাপর্বে এসে দেখা যায়, ময়দানব অর্জুন ও কৃষ্ণের প্রত্যুপকারে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভা নির্মাণ করে দেন। সে সভা ছিল অপার ঐশ্বর্যমণ্ডিত *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ১০১]* —

> ঈশান কোণে যাত্রা ক'রে ময় মৈনাক পর্বতে পর্বতে উপস্থিত হলেন। তিনি গদা, শঙ্খ, বৃষপর্বার স্ফটিকময় সভাদ্রব্য, এবং কিংকর নামক রাক্ষসগণ কর্তৃক রক্ষিত ধনরাশি সংগ্রহ ক'রে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন এবং ভীমকে গদা আর অর্জুনকে দেবদত্ত শঙ্খ দিলেন। তার পর ময় ত্রিলোকবিখ্যাত দিব্য মণিময় সভা নির্মাণ করলেন যার দীপ্তিতে যেন সূর্যের প্রভাও পরাস্ত হ'ল। এই বিশাল সভা নবোদিত মেঘের ন্যায়। আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে রইল। তার প্রাচীর ও তোরণ রত্নময়, অভ্যন্তর বহুবিধ উত্তম দ্রব্যে ও চিত্রে সজ্জিত। কিংকর নামক আট হাজার আকাশচারী মহাকায় মহাবল রাক্ষস সেই সভা রক্ষা করত। ময়দানব সেখানে একটি অতুলনীয় সরোবর রচনা করলেন, তার সোপান স্ফটিকনির্মিত, জল অতি নির্মল, বিবিধ মণিরত্নে সমাকীর্ণ এবং স্বর্ণময় পদ্ম মৎস্য ও কূর্মে শোভিত।

এই বিষয়টি বাংলা রূপকথার বিভিন্ন গল্পে স্থান লাভ করেছে। বাংলা রূপকথায় ঐশ্বর্যমণ্ডিত সভা নির্মাণ প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। রূপকথার আবহ সৃষ্টিতে বিষয়টি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

'কিরণমালা' গল্পের অরুণ-বরুণ ও কিরণ এক ব্রাহ্মণের তিন ছেলে-মেয়ে। তারা তাদের দেশের রাজাকে একদিন জল দিয়ে প্রাণে রক্ষা করে। রাজা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে বলেন তোমাদের কিছু প্রয়োজন পড়লে আমাকে জানাবে। তখন কিরণ তার দাদাদের কাছে রাজার কী থাকে জানতে চাইলে উত্তরে অরুণ-বরুণ বলে, আমরা ঠিক জানি না, তবে পুঁথিতে আছে রাজার হাতী, ঘোড়া, অট্টালিকা থাকে। এ কথা শুনে কিরণ বলে, হাতি-ঘোড়া কোথায় পাই। তোমরা অট্টালিকা বানাও। বোনকে 'আচ্ছা' বলে অরুণ-বরুণ নানাবিধ দ্রব্যের সমন্বয়ে বার মাসে ছত্রিশ দিনে বিশাল এক অট্টালিকা তৈরি করে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৫৫-৫৬]* —

> সে অট্টালিকা দেখিয়া ময়দানব উপোস করে, বিশ্বকর্মা ঘর ছাড়ে – অরুণ বরুণ কিরণের অট্টালিকা সূর্যের আসন ছোঁয়, চাঁদের আসন কাড়ে! শ্বেত পাথর ধব্‌ধব্, শ্বেত মাণিক রব্ রব; দুয়ারে দুয়ারে

Dhaka University Institutional Repository

রূপার কবাট, চূড়ায় চূড়ায় সোনার কলসী! অট্টালিকার চারিদিকে ফুলের গাছ, ফলের গাছ–পক্ষী-পাখালীতে আঁটে না। মধুর গন্ধে অট্টালিকা ভুর্‌ভুর্‌, পাখীর ডাকে অট্টালিকা মধুরপুর! অরুণ বরুণ কিরণের বাড়ী দেবে দৈত্য চাহিয়া দেখে!

প্রভাব : সভা নির্মাণ কোনো পৌরাণিক বিষয় নয়। প্রায় প্রত্যেক রাজাই রাজসভা নির্মাণ করেছেন। কিন্তু রূপকথায় সভা নির্মাণের ক্ষেত্রে পৌরাণিক চরিত্র বিশ্বকর্মা ও ময়দানবের প্রসঙ্গ চলে আসায় সেই ঐশ্বর্যমন্ডিত সভা নির্মাণের কৌশল পুরাণ-প্রভাবিত হয়ে পড়েছে।

পার্থক্য : উভয় ক্ষেত্রে যে সভা নির্মাণ করা হয়েছে, তা ঐশ্বর্যমন্ডিত হলেও নির্মাণের উপাদান ও সৌন্দর্য বর্ণনায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বকীয়তা আছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. নববধূ বরণ

'নববধূ বরণ' পুরাণের একটি আলোচিত বিষয়। বিষয়টি যেমনভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির উপাদান হয়ে গিয়েছে, তেমনি বাংলা রূপকথার উল্লেখযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বধূবরণ সংক্রান্ত আচার আর্য সংস্কৃতির একটি ঐতিহ্য। উল্লেখিত এ প্রসঙ্গটি পুরাণের প্রথা পদ্ধতির প্রচলন সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়।

রামায়ণের বালকাণ্ডে অযোধ্যারাজ দশরথের চার পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন যথাক্রমে জনক রাজের চার কন্যা সীতা, উর্মিলা, মণ্ডবী, শ্রুতকীর্তিকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। তারপর চার রাজপুত্র তাদের স্ত্রীদের নিয়ে অযোধ্যায় আসেন। চার পুত্রের বিয়ের সংবাদে অযোধ্যায় আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। নববধূরা রাজপ্রাসাদে এলে দশরথের তিন রানি তাদের মঙ্গালাচরণ সহকারে বরণ করে নেন *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ১২২]*—

> দেবী কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজমহিষীরা মঙ্গালাচরণ সহকারে হোমপূত কৌশেয়-বসনসুশোভিত বধূগণের প্রতিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা উঁহাদিগকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন এবং উঁহাদিগকে লইয়া গৃহদেবতাদিগকে প্রণাম ও নমস্যদিগকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন।

বাংলা রূপকথায় রাজপুত্র ও রাজকন্যার বিয়ের পর রানিদের দ্বারা নববিবাহিতা রাজবধূকে বরণ করে নেয়ার বিষয়টি বাংলা রূপকথাতেও আলোচিত হয়েছে —

'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে রাজার পাঁচ পুত্র ময়ূরপঙ্খী করে কলাবতী রাজকন্যাকে তাদের রাজ্যে নিয়ে আসেন। পাঁচ রাজপুত্র তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলে পাঁচ রানি কলাবতী রাজকন্যাকে তাদের পুত্রবধূ হিসেবে বরণ করে নেন *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ১৭]*—

> রাণীরা ধান-দূর্বা দিয়া, পঞ্চদীপ সাজাইয়া, শাঁখ শঙ্খ বাজাইয়া কলাবতী রাজকন্যাকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

প্রভাব : নববধূ বরণের আচার পৌরাণিক তথা আর্যপ্রথা। পুরাণে নববধূ বরণের যে কৌশল লক্ষ করা যায়, বাংলা রূপকথাতেও সেই একই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। রূপকথার নববধূ বরণ মিথ-এর সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণ।

পার্থক্য : মিথ ও রূপকথায় নববধূ বরণের কৌশলে তেমন কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. পাশাখেলায় পণ-প্রথা

'পাশাখেলায় পণ-প্রথা' বাংলা রূপকথায় বর্ণিত এ বিষয়টি পুরাণের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। পুরাণের কাহিনীতে এটি একটি নতুন মাত্রাও যোগ করেছে। বিশেষ করে মহাভারতের কাহিনীতে পাশাখেলায় পণ-প্রথা বিষয়টি নতুন আখ্যানের ধারা ও দিক উন্মোচন করেছে। এমনকী এই পণ-প্রথাই মহাভারতের বিখ্যাত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনুঘটক।।

কৌরবদের আমন্ত্রণে যুধিষ্ঠির শকুনির সাথে পাশা খেলেন। পাশাখেলায় তিনি শকুনির কাছে বার বার পরাজিত হন এবং শর্তানুযায়ী পণ দিয়ে দেন। এভাবে তিনি সর্বস্বান্ত হন। এই পণের ফলে তাদেরকে বারো বছরের বনবাস কাটাতে হয় *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ১২৮]* —

> যুধিষ্ঠির বললেন, শকুনি, আপনি কপট ক্রীড়ায় আমার পণ জিতে নিলেন। যাই হ'ক, সহস্র সুবর্ণে পূর্ণ আমার অনেক মঞ্জুষা আছে, এবারে তাই আমার পণ। শুকনি পুনর্বা'র পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। তারপর যুধিষ্ঠির বললেন, সহস্র রথের সমমূল্য ব্যাঘ্রচর্মাবৃত কিংকিণীজাল মণ্ডিত সর্ব উপকরণ সমেত ওই উত্তম রথ যাতে আমি এখানে এসেছি, এবং তার কুদুমশুভ আটটি অশ্ব আমার পণ। এই কথা শুনেই শকুনি পূর্ববৎ শঠতা অবলম্বন ক'রে পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। তার পর যুধিষ্ঠির পর পর এইসকল পণ রাখলেন। – সালংকারা নৃত্য-গীতাদিনিপুণা এক লক্ষ তরুণী দাসী; কর্মকুশল উষ্ণীষকুণ্ডলধারী নম্রস্বভাব এক লক্ষ যুবক দাস; এক হাজার উত্তম হস্তী; স্বর্ণধ্বজ ও পতাকায় শোভিত এক হাজার রথ যার প্রত্যেক রথী যুদ্ধকালে এবং অন্যকালেও সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতন পান; গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ অর্জুনকে যেসকল বিচিত্রবর্ণ অশ্ব দিয়েছিলেন; দশ হাজার রথ ও দশ হাজার শকট; ষাট হাজার বিশালবক্ষা বীর সৈনিক যারা দুগ্ধ পান করে এবং শালিতণ্ডুলের অন্ন খায়; স্বর্ণ মুদ্রায় পূর্ণ চার শত ধনভাণ্ড। এ সমস্তই শকুনি শঠতার দ্বারা জয় করলেন।

'পাশাখেলায় পণ-প্রথা' বেদ ও পুরাণে বর্ণিত এই বিষয়টি বাংলা রূপকথার কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। পুরাণে পাশা খেলায় মানুষের ধনী ও নিঃস্ব হওয়ার দৃষ্টান্তের ন্যায় বাংলা রূপকথায় পাশা খেলা কাহিনীতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

'ডালিম কুমার' গল্পে ডালিম কুমারের মাকে খেয়ে রাক্ষসী তার মায়ের রূপ ধারণ করে। রাক্ষসীর সাতটি পুত্র সন্তান হয়। তারা একটু বড় হলে দেশ ভ্রমণে যেতে চায়। তখন রাজা বড়কুমারকে তাদের সঙ্গে পাঠান। পথিমধ্যে বড়কুমার রাক্ষসী রানির জাদুকর্মের ফলে অন্ধ হয়ে যায়। এত পথ ভুলে অন্য সাত পুত্র পাশাবতীর পুরে উপস্থিত হয়। পাশাবতী পাশা সাজিয়ে বসে থাকে। পাশাখেলায় যে তাকে হারাতে পারবে ছয় বোনসহ সে তাকে বরণ করবে। আর তার কাছে যে পাশাখেলায় পরাজিত হবে তাকে সে খেয়ে খেলবে। রাজপুত্ররা পাশাবতীর সাথে পাশা খেলে পরাজিত হয়। তখন পাশাবতী রাজপুত্রদের কুচি কুচি করে কেটে খেয়ে ফেলে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৮১]* —

Dhaka University Institutional Repository

পাশাবতীর পুরে পাশাবতী দুয়ারে নিশান উড়াইয়া ঘর-কুঠরী সাজাইয়া, সাজিয়া, বসিয়া আছে। যে আসিয়া পাশা খেলিয়া হারাইতে পারিবে, আপনি আপনার ছয় বোন নিয়া তাহাকে বরণ করিবে।

প্রভাব : পাশা খেলা আর্য সংস্কৃতির বিষয়। পুরাণে পাশাখেলার বর্ণনা ও এর কুপ্রভাব দেখানো হয়েছে। হিন্দু ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদেও পাশাখেলায় পণ-প্রথাকে সমাজের জন্যে ক্ষতিকর বলা হয়েছে। তাই রূপকথায় বর্ণিত 'পাশাখেলায় পণ-প্রথা'র নেতিবাচকতা নিঃসন্দেহে পুরাণ প্রভাবিত।

পার্থক্য : চরিত্র ও কাহিনীর ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. মৃত মানুষের জীবন ফিরে পাওয়া

'মৃত মানুষের জীবন ফিরে পাওয়া' রূপকথায় উল্লেখিত এই প্রসঙ্গটি পুরাণ প্রভাবিত । মহাভারতের উপাখ্যানে এ ধরনের কাহিনী গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে।

বনপর্বে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর মতো সতী নারী আরও আছে কি না জানতে চাইলে মার্কণ্ডেয় তাঁকে সাবিত্রী সম্পর্কে জানান। সাবিত্রী ছিলেন সত্যবানের স্ত্রী। অল্পায়ু হবেন জেনেও সত্যবানকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। যম তাঁর স্বামীর আত্মা নিয়ে যাবার সময় সাবিত্রী যমকে অনুসরণ করেন। তিনি ধর্মজ্ঞান ও পতিব্রতা দ্বারা যমকে সন্তুষ্ট করেন। ফলে, যম সত্যবানের আত্মা ফিরিয়ে দিলে সত্যবান পুনরায় জীবিত হন *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ২৫৭]* —

> সাবিত্রী বললেন, হে মানদ, যে বর আমাকে দিয়েছেন তা আমার পুণ্য না থাকলে আপনি দিতেন না। সেই পুণ্যবলে এই বর চাচ্ছি – সত্যবান জীবনলাভ করুন, পতি বিনা আমি মৃততুল্য হয়ে আছি। পতিহীন হয়ে আমি সুখ চাই না, স্বর্গ চাই না, প্রিয়বস্তু চাই না, বাঁচতেও চাই না। আপনি শতপুত্রের বর দিয়েছেন, অথচ আমার পতিকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। সত্যবান বেঁচে উঠুন এই বর চাচ্ছি, তাতে আপনার বাক্য সত্য হবে। ধর্মরাজ যম বললেন, তাই হবে। সত্যবানকে পাশমুক্ত ক'রে যম হৃষ্টচিত্তে বললেন, তোমার পতিকে মুক্তি দিলাম, ইনি নীরোগ বলবান ও সফলকাম হবেন, চার শত বৎসর তোমার সঙ্গে জীবিত থাকবেন, যজ্ঞ ও ধর্মকার্য ক'রে খ্যাতিলাভ করবেন।
>
> যম চ'লে গেলে সাবিত্রী তাঁর স্বামীর মৃতদেহের নিকট ফিরে এলেন। তিনি সত্যবানের মাথা কোলে তুলে নিয়ে বললেন, রাজপুত্র, তুমি বিশ্রাম করেছ, তোমার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে, যদি পার তো ওঠ। দেখ, রাত্রি গাঢ় হয়েছে। সত্যবান সংজ্ঞালাভ ক'রে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, তার পর বললেন, আমি শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে তোমার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তুমি আমাকে আলিঙ্গন ক'রে ধ'রে ছিলে। আমি নিদ্রাবস্থায় ঘোর অন্ধকার এবং এক মহাতেজা পুরুষকে দেখেছি। একি স্বপ্ন না সত্য?

'মৃত মানুষের জীবন ফিরে পাওয়া' পুরাণে উল্লেখিত এই প্রসঙ্গটি বাংলা রূপকথার কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। বাংলা রূপকথার যে গল্পে সাধারণ মানব-মানবীর পাশাপাশি দেব-দেবতার প্রসঙ্গও এসেছে, সে গল্পে মৃত মানুষের জীবন ফিরে পাওয়া প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে।

'পুষ্পমালা' গল্পে পুষ্প তার মৃত স্বামীর কাটা মুন্ড নিয়ে কাঁদতে থাকে। তার কান্নায় নদীর জলও কাঁদে। সেই রাতে কৈলাস পর্বতে যাচ্ছিলেন। পুষ্পের কান্না শুনে পার্বতী শিবকে বলেন, কার কান্না শোনা যায়। শিব এড়িয়ে যেতে চাইলেও দেবীর অনুরোধে তাঁরা ছদ্মবেশে পুষ্পের কাছে আসেন। পুষ্পের কাছে এসে তাঁরা সব কথা শুনে পুষ্পের মৃত স্বামীকে জীবন্ত করার অভিপ্রায়ে কাটা মুন্ড চান। পুষ্প ছলনা ভেবে মুন্ড দিতে অসম্মতি জানালেও দেব-দেবী তার মৃত স্বামীকে জীবন্ত করে আলোক-রথে কৈলাসে চলে যান *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৩৬১]* —

Dhaka University Institutional Repository

পুষ্প কাঁদেন, – নদীর জল কাঁদে, বনের পশুপক্ষী বনতরু কাঁদে, পাথর পাষাণ ফাটে!
কান্নায় বনপুরী ছাইয়া দিন গেল, ভীষণ আঁধার রাত এল।
সেই আঁধার রাত্রে, শিব পার্বতী কৈলাসে যান। আকাশের তারা পাতালের বালু গণিতে গণিতে দুই দেবতা চলিয়াছেন।
পার্বতী বলেন, "দেবতা! কা'র যেন রোদন শুনি! –"
"আবার কা'র? – যা'র দুঃখ, তার। ওসবে আমাদের কাজ কি? – চল।"
পার্বতী বলেন, – "না না, দেবতা!

কোন্ অভাগী পতিহারা, কোন্ জননী পুত্রছাড়া,
না দেখিলে প্রাণ নাহি মানে।"

'দৃষ্টি' করিয়া পার্বতী দেখিলেন, –

আধেক জলে, আধেক নারী, কাঠামুড বুকে করি'
"পতি! – পতি!" – কাঁদে সেই বনে!

আর কী দেবীর প্রাণে সয়? – অস্থির হইয়া পার্বতী বলিলেন, – "দেবতা! জীবন ওকে দিতেই হবে! রথ নামাও।"
কি আর করেন শিব? রথ নামাইয়া, দুইজনে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মূর্তি ধরিয়া আসিয়া বলিলেন, – "কন্যা, তুমি কাঁদ কেন?"

কাঁদিয়া পুষ্প বলেন, –

"বিজন বনে বুড়াবুড়ী কে হও তোমরা বা মা আমার!
আমার দুখ কউক নদীর জল!
পিতামাতার সত্য রাখি' উড়াল দিলাম দু'টি পাখী,
দুখিনীর সম্বলে মাগো! ডাকু মারিল শর!"

শিব পার্বতী বলিলেন, – "মা! বুঝিলাম! আচ্ছা, কাটামুড তুমি আমাদের হাতে দাও, ক্ষণেক তুমি বনের মুখ হইয়া চোখ বুজ।"
কন্যা বলেন, – 'না, না! – কে তোমরা ছলনা করিতে আসিয়াছ? – তাহা আমি দিব না!"
হাসিয়া শিব পার্বতী বলিলেন, – "সতী! তবে দ্যাখ্।"
কি দেখিবে পুষ্প? মাটিতে দেখিবে কি আকাশে দেখিবে? সম্মুখে জীয়ন্ত কুমার! আকাশের দেবতার আলোক-রথ!

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব : 'মৃত মানুষের জীবন ফিরে পাওয়া' পুরাণের আলোচিত বিষয়। তাই রূপকথার 'মৃত মানুষের জীবন ফিরে পাওয়া' প্রসঙ্গটি নিঃসন্দেহে পুরাণ প্রভাবিত। উভয় ক্ষেত্রেই পতীব্রতা স্ত্রী স্বামীর জীবন ফিরে পেয়েছে দৈবিক সাহায্যে।

পার্থক্য : মূল বিষয়বস্তু একই। শুধু রূপকথাতে যমের পরিবর্তে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন শিব-পার্বতী।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. নবজাতককে জলে ভাসিয়ে দেয়া

'নবজাতকে জলে ভাসিয়ে দেয়া' বিষয়টি মিথ-এর বিভিন্ন আখ্যান ও উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে। পুরাণে (এখানে মহাভারত) দেবী কুন্তীর সন্তান কর্ণের জন্মগ্রহণ এবং তাকে জলে ভাসিয়ে দেয়ার কাহিনীটি যেমন আখ্যানে নতুন দিক উন্মোচন করেছে, তেমনি তা বাংলা রূপকথাতেও প্রভাব ফেলেছে।

মহাভারতের আদি পর্বে যদুশ্রেষ্ঠ শূরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করা এবং নিঃসন্তান কুবন্তীভোজের পালিত কন্যার নাম কুন্তী। একবার ঋষি দুর্বাসা কুন্তীর আতিথেয়তায় খুশি হয়ে কুন্তীকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে বলেন যে, তুমি যে দেবতাকে এই মন্ত্রে আহ্বান করবে তিনি তোমায় পুত্রসন্তান দান করবেন। কৌতূহলবশত কুন্তী সূর্যকে ডাকলে সূর্যের সাথে কুন্তীর মিলনে কবচ-কুণ্ডলধারী পুত্র সন্তান কর্ণের জন্ম হয়। তবে সমাজের ভয়ে কুন্তী তাঁর দেবসমতুল্য সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দেন *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ৪৭]*—

> কুন্তীর একটি দেবকুমার তুল্য পুত্র হ'ল। এই পুত্র স্বাভাবিক কবচ (বর্ম) ও কুণ্ডল ধারণ ক'রে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, ইনিই পরে কর্ণ নাম খ্যাত হন। কলঙ্কের ভয়ে কুন্তী তাঁর পুত্রকে একটি পাত্রে রেখে জলে ভাসিয়ে দিলেন।

সদ্য জন্মগ্রহণ করা শিশু তথা নবজাতককে জলে ভাসিয়ে দেয়া পুরাণে উল্লেখিত এই বিষয়টি বাংলা রূপকথার কাহিনীতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি কাহিনীর বিন্যাস ও নতুন রূপ পরিগ্রহ করার উদ্দেশ্যে গুরুত্বের সাথেই বাংলা রূপকথাতে স্থান লাভ করেছে।

'কিরণমালা' গল্পে এক রাজা মৃগয়ায় গিয়ে দিনে পশু শিকার করলেও রাতের বেলায় গোপনে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। একদিন এক গৃহস্থের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গৃহস্থের তিন কন্যার ইচ্ছার কথা জানতে পারেন। পরের দিন রাজা পাইক পাঠিয়ে তিন বোনকে রাজদরবারে নিয়ে আসেন এবং তাদের প্রত্যেকের ইচ্ছানুযায়ী বড় বোনকে ঘেসেড়ার সাথে; মেজ বোনকে সূপকারের সাথে এবং ছোট বোনকে নিজে বিয়ে করেন। কয়েক বছর পর রানি গর্ভবতী হলে সন্তান হওয়ার আগে থেকে রাজা রানিকে দেখাশুনা করার জন্যে রানির দুই বোনকে নিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে রাজা রানির ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কিন্তু রানির বোনেরা রানির এই সুখ সহ্য করতে পারে নি। তাই তিন প্রহর বেলায় রানির পুত্র সন্তান হলে তার বোনেরা সন্তানের মুখে নুন, তুলা দিয়ে, ভাঁড়ে তুলে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয় *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৫২]*—

> রানি কি আর অত জানেন ? দিনদুপুরে, দুইবো্ন, এঘর ওঘর সাতঘর আঁদি সাঁদি ঘোরে। রানি জিজ্ঞাসা করেন, – "কেন লো দিদি, কি চা'স?"
>
> দিদিরা বলে– "না, না, এই, – আঁতুড়ে কত কি লাগে, তাই জিনিস পাতি খুঁজি।" শেষে, বেলাবেলি দুই বোনে রানির আঁতুড়ঘরে গেল।

Dhaka University Institutional Repository

তিন প্রহর রাত্রে, আঁতুড়ঘরে, রানির ছেলে হইল।— ছেলে যেন চাঁদের পুতুল! দুই বোনে তাড়াতাড়ি হাতিয়া-পাতিয়া কাঁচা মাটির ভাঁড় আনিয়া ভাঁড়ে তুলিয়া, মুখে নুন তুলা দিয়া, সোনার চাঁদ মেলে নদীর জলে ভাসাইয়া দিল !

প্রভাব : পুরাণে বর্ণিত আখ্যানটি রূপকথায় প্রত্যক্ষ প্রভাব না ফেললেও পরোক্ষ একটি প্রভাব অবশ্যই ফেলেছে। কারণ মহাভারতে সদ্যজাত সন্তানকে পাত্রে করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়া হয় এবং রূপকথাতেও তেমনিভাবে সদ্যজাত সন্তানকে পাত্রে করে জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়।

পার্থক্য : মিথ এবং রূপকথার কাহিনীর মূল বিষয় 'সদ্যোজাত সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দেয়া' একই হলেও তার অনুষঙ্গ ভিন্ন। মহাভারতে কুন্তী স্ব-ইচ্ছায় কলঙ্ক থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু রূপকথাতে বর্ণিত গল্পটিতে সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দেয়ার পেছনে কাজ করেছে ঈর্ষা। নিজের বোনের ভালো সহ্য করতে না পেরে অন্য দুই বোন এক্ষেত্রে সদ্যোজাত শিশুর মুখে লবণ দিয়ে জলে ভাসিয়ে দেয়।

মিথ এবং রূপকথার কাহিনীর ভিন্নতার দরুন এ ধরনের পার্থক্য বিদ্যমান। মিথ-এর মাধ্যমে শুধু কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত আলোচিত হলেও রূপকথার কাহিনী বিস্তৃত উক্ত বিষয়টিকে কেন্দ্র করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. নদীর জলে নবজাতক কুড়িয়ে পাওয়া

বাংলা রূপকথায় যে 'নদীর জলে নজবজাতক কুড়িয়া পাওয়া' বিষয়টি উল্লেখ করা আছে তা মিথ-এর আখ্যানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মহাভারতে দেখা যায়, কুমারী মা কুন্তী কলঙ্কের ভয়ে তার সদ্যোজাত সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দিলে তা এক ব্রাহ্মণ কুড়িয়ে পান।

মহাভারতের আদি পর্বে কুন্তী ঋষি দুর্বাসাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে, ঋষি তাকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দেন এবং বলেন, এই মন্ত্রে যে দেবতাকে তুমি আহ্বান করবে সে তোমার মনোকামনা পূর্ণ করবে। কুন্তী কৌতূহলবশত সূর্যদেবকে আহ্বান করলে সূর্যদেব বলেন, কুন্তী তোমার আমার মিলনে পুত্র সন্তান হলেও তুমি কুমারী থাকবে। তখন কবচধারী কর্ণের জন্ম হয়। কিন্তু কুমারী কুন্তী কলঙ্কের আশঙ্কায় তার পুত্রকে একটি পাত্রে করে ভাসিয়ে দেন। পরবর্তীতে সেই পুত্রকে সূত বংশের অধিরথ ও তাঁর স্ত্রী রাধা দেখতে পেয়ে ঘরে নিয়ে যান এবং লালন-পালন করে *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ৪৭]* —

> কুন্তীর একটি দেবকুমার তুল্য পুত্র হ'ল। এই পুত্র স্বাভাবিক কবচ (বর্ম) ও কুন্তল ধারণ ক'রে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, ইনিই পরে কর্ণ নামে খ্যাত হন। কলঙ্কের ভয়ে কুন্তী তাঁর পুত্রকে একটি পাত্রে রেখে জলে ভাসিয়ে দিলেন। সূতবংশীয় অধিরথ ও তাঁর পত্নী রাধা সেই বালককে দেখতে পেয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং বসুষেণ নাম দিয়ে পুত্রবৎ পালন করলেন।

'নদীর জলে নবজাতক কুড়িয়া পাওয়া' পুরাণে উল্লেখিত এই বিষয়টি বাংলা রূপকথার কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। বাংলা রূপকথায় পুরাণের ন্যায় উক্ত বিষয়টি আলোচিত হয়েছে যা কাহিনীতে নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে।

'কিরণমালা' গল্পে রানি গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবের পূর্বে রাজা রানির অনুরোধে রানিকে দেখাশোনা করার জন্যে রানির বড় দু বোনকে নিয়ে আসেন। কিন্তু মঙ্গল করার পরিবর্তে ছোট বোনের সুখে ঈর্ষান্বিত হয়ে রানির সদ্য জন্মগ্রহণ করা সন্তানের মুখে লবণ ও তুলা দিয়ে ভাঁড়ে তুলে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। তারা রাজা ও রানিকে জানতেও দেয় নি যে তিন প্রহর বেলায় রানির পুত্র সন্তান হয়েছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাচ্চাটি বেঁচে যায় এবং বাচ্চাটিকে একজন ব্রাহ্মণ জলের ভাঁড়ের ভেতর পায়। তিনি আহ্নিক করার সময় একটি ভাঁড় ভেসে আসতে দেখেন এবং তার মধ্যে সদ্য ছেলের কান্না শুনতে পান। ব্রাহ্মণ দেখেন বাচ্চাটি একটি দেবশিশু *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৫৩]* —

> এক ব্রাহ্মণ নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন, – স্নান-টান সারিয়া, ব্রাহ্মণ, জলে দাঁড়াইয়া জপ-আহ্নিক করেন, – দেখিলেন, এক মাটির ভাঁড় ভাসিয়া আসে। না, –ভাঁড়ের মধ্যে সদ্য ছেলের কান্না শোনা যায়। আঁকুপাঁকু করিয়া ব্রাহ্মণ ভাঁড় ধরিয়া দেখেন, – এক দেবশিশু !

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব : রূপকথায় বর্ণিত গল্পটিতে মিথ-এর প্রভাব দেখা যায়। দুটি কাহিনীর বিন্যাস একই ধরনের। কাহিনী দুটির উৎপত্তি এবং সমাপ্তি প্রায় একইরকম।

পার্থক্য : ঘটনা বিন্যাসের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য না থাকলেও কাহিনী ও চরিত্রের সামান্য কিছু ভিন্নতা রূপকথাকে বিশেষত্ব দান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. রাক্ষস-রাক্ষসীর নর-মাংসের লোভ

বাংলা রূপকথায় বর্ণিত রাক্ষস-রাক্ষসীর নর-মাংসের প্রতি লোভের বিষয়টি মিথ প্রভাবিত। পুরাণে এ কাহিনী সম্পূর্ণ আখ্যানকে প্রভাবিত না করলেও তা নতুন উপাখ্যান সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

মহাভারতের আদিপর্বে পঞ্চপাণ্ডবেরা এক বনের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় শাল গাছে বাস করা হিড়িম্ব নামক এক রাক্ষস তাদের মাংসের প্রতি লালায়িত হয়। হিড়িম্ব তার বোন হিড়িম্বাকে পাণ্ডবদের মেরে নিয়ে আসতে বলে কিন্তু হিড়িম্বা ভীমসেনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে না মেরে বিয়ে করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। নর-মাংসের লোভে লালায়িত হিড়িম্ব তা জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডবদের খেতে চাইলে ভীম তাকে হত্যা করে। পাণ্ডবদের অনুমতিতে ভীম ও হিড়িম্বার বিয়ে হয় এবং তাদের ঔরসে ঘটোৎকচের জন্ম হয় *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ৬৬]* —

> পাণ্ডবদের দেখে এই রাক্ষসের মনুষ্যমাংস খাবার ইচ্ছা হ'ল, সে তার ভগিনী হিড়িম্বাকে বললে, বহু কাল পরে আমার প্রিয় খাদ্য উপস্থিত হয়েছে, তার গন্ধে আমার লালা পড়ছে, জিহ্বা বেরিয়ে আসছে। আজ নরম মাংসে আমার ধারাল আটটি দাঁত বসাব, মানুষের কণ্ঠ ছেদন ক'রে ফেনিল রক্ত পান করব।

'রাক্ষস-রাক্ষসীর নর-মাংসের প্রতি লোভ' পুরাণে উল্লেখিত এই বিষয়টি বাংলা রূপকথায় বর্ণিত হয়েছে।

'নীলকমল আর লালকমল' গল্পটিতে দেখা যায়, এক রাজার দুই রানি। একজন লক্ষ্মী রানি যার ছেলে কুসুম এবং আর এক রানি রাক্ষসী যার ছেলে অজিত। রাক্ষসীর ইচ্ছা কুসুমের কচি মাংসের অম্বল রান্না করে খাবে, কিন্তু কুসুম আর অজিতের জন্যে সে তা করতে পারে না। লক্ষ্মী রানি মারা গেলে রাক্ষসী রানি কুসুমের মাংস খায় এবং এর বিরোধিতা করার জন্যে নিজের ছেলেকেও খেয়ে ফেলে একটি সোনার ডেলা ও একটি লোহার ডেলা উগড়ে দেয় *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৬৫]* —

> রাক্ষসী-রানির মনে কাল, রাক্ষসী-রানির জিভে লাল। রাক্ষসী কি তাহা দেখিতে পারে?- কবে সতীনের ছেলের কচি কচি হাড়-মাংসের ঝোল অম্বল রাঁধিয়া খাইবে;— তা পেটের দুষ্টু ছেলে সতীন-পুতের সাথ ছাড়ে না। রাগে রাক্ষসীর দাঁতে-দাঁতে কড়্ কড়্ পাঁচ পরাণ সর্ সর্।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব : মিথ-এ নর-মাংসের প্রতি রাক্ষসের যে লোভ দেখানো হয়েছে তার প্রভাব রূপকথায় দেখা যায়।

পার্থক্য : পুরাণে রাক্ষস মাংস খেতে না পারলেও রূপকথায় রাক্ষসী মাংস খেতে সমর্থ হয়েছে। রূপকথার গল্পটি এই একটি মাত্র বিষয়কেন্দ্রিক। কিন্তু মিথের নানা কাহিনীতে বিষয়টি থাকলেও তা মূল আখ্যানে তেমন প্রভাব ফেলতে পারে নি; শুধু নতুন উপকাহিনীর জন্ম দিয়েছে।

পুরাণে যে মানুষ চরিত্রের বর্ণনা করা হয়েছে তারা অসাধারণ ক্ষমতাশালী বীর পুরুষ এবং তাদের হাতে রাক্ষসের মৃত্যু হয়েছে। তাই রূপকথায় রাক্ষসের ইচ্ছা পূরণ হলেও মিথ-এ তা সম্ভব হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

২০. পাশাখেলা

'পাশাখেলা' প্রসঙ্গটি মিথ-এর আখ্যানে গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। মূলত বাংলা রূপকথায় এই প্রসঙ্গটি মিথ-এর প্রভাবে প্রভাবিত। পুরাণে দেখা যায়, রাজারা বিনোদনের মাধ্যমে কিংবা জুয়া হিসেবে পাশা খেলেন।

মহাভারতের সভাপর্বে দেখা যায়, দুর্যোধন ছলে বলে যেভাবেই হোক পাণ্ডবদের বিষয়-সম্পত্তি নিতে চান। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে এসব করতে বারণ বলেন। তিনি আরও বলেন, যুধিষ্ঠির তোমার ভাই তাই যুধিষ্ঠিরের সাথে হিংসা করা ঠিক নয়। তখন দুর্যোধন বলেন, জাতি অনুসারে কেউ শত্রু নয় বৃত্তি একই হলে সে শত্রু। দুর্যোধনের কথা শুনে শকুনি বলেন, সে পাশা খেলার মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের সব কেড়ে নেবে। একথা শুনে দুর্যোধন পাশাখেলার ব্যবস্থা করার আহ্বান করেন। দ্যূতক্রীড়ার মাধ্যমে এভাবে কৌরবেরা পাণ্ডবদের সব কিছু জিতে নেয় *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭; ১২৬]*—

> শকুনি বললেন, যুদ্ধিষ্ঠিরের যে সমৃদ্ধি দেখে তুমি সন্তপ্ত হচ্ছ তা আমি দ্যূতক্রীড়ায় হরণ করব, তাকে আহ্বান কর। আমি সুদক্ষ দ্যূতজ্ঞ, সেনার সম্মুখীন না হয়ে পাশা খেলেই অজ্ঞ পাণ্ডবদের জয় করব তাতে সন্দেহ নেই।

রাজন্যবর্গের বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে 'পাশাখেলা' পুরাণে উল্লেখিত এই বিষয়টি বাংলা রূপকথার কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। বাংলা রূপকথায় রাজা-বাদশাদের নিয়ে যেসব গল্প প্রচলিত আছে তাতে পাশাখেলা প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা আছে।

'ডালিম কুমার' গল্পে বর্ণিত রাজার একমাত্র রানির আয়ু পাশার ভেতরে থাকে। এক রাক্ষসী রানিকে হত্যা করার নানা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। অবশেষে রাজা যখন মৃগয়ায় যান তখন রাজপুত্র সখাদের নিয়ে পাশা খেলতে থাকলে, রাক্ষসী ভিখারিণী সেজে রাজপুত্রের কাছে পাশাজোড়া চায়। রাজপুত্র তা রাক্ষসীকে দিয়ে দেন। তখন রাক্ষসী রানিকে হত্যা করে তার মাংস খেয়ে ফেলে এবং নিজে রানির মতো চেহারা ধারণ করে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৭৯]*—

> একদিন রাজা মৃগয়ায় গিয়াছেন, রাজপুত্র সখা সাথী পাঁচজন লইয়া পাশা খেলিতেছিলেন; দেখিয়া, রাক্ষসী, এক ভিখারিণী সাজিয়া রাজপুত্রের কাছে গিয়া পাশা জোড়া চাহিল; রাজপুত্র কি জানেন? হেলায় পাশা জোড়া ভিখারিণীকে দিয়া ফেলিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব : এক্ষেত্রে শুধু পাশাখেলার প্রসঙ্গ ছাড়া খেলার কারণ এবং গল্পে তার প্রভাব ইত্যাদিতে কোনো বিশেষ মিল মিথ এবং রূপকথাতে দেখা যায় না।

পার্থক্য : এ গল্পটির মিল থাকলেও খেলার কারণ এবং ফলাফলের কোনো মিল রক্ষিত হয় নি। রূপকথায় পাশার ভেতরে মানুষের জীবন রক্ষিত হলেও মিথ-এ ধরনের কোনো লক্ষণ প্রকাশিত হয় নি। মিথ-এ পাশাখেলার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও রূপকথায় পাশা খেলা গৌণ বিষয় হিসেবে দেখা যায়। রূপকথায় পাশাখেলার চেয়ে পাশা জোড়ায় মানুষের জীবন রক্ষার বিষয়টিই মুখ্য।

Dhaka University Institutional Repository

২১. জলে ডুবে রূপবান / রূপবতী হওয়া

বাংলা রূপকথার কাহিনীতে জলে ডুব দিয়ে রূপবান হওয়ার যে বিষয়টির উল্লেখ আছে তার সাথে মিথ-এর উপাখ্যানের মিল লক্ষণীয় । পুরাণে দেখা যায়, দেব চিকিৎসকের সহায়তার ফলে সাধারণ মানব জলে ডুব দেয়ায় তার কুৎসিত চেহারা সুন্দর হয়ে যায় ।

মহাভারতের বনপর্বে চ্যবন ও সুকন্যা এক দম্পতি। সুকন্যার চেহারা সুন্দর হলেও চ্যবনের চেহারা খুবই খারাপ। একদিন অশ্বিনী কুমারদ্বয় সুকন্যাকে স্নান করার সময় নগ্ন অবস্থায় দেখে মুগ্ধ হন। তারা সুকন্যাকে বলে তুমি দেখতে দেবীদের চেয়ে সুন্দর। তুমি চ্যবনের মতো কুৎসতি চেহারার পতিকে ত্যাগ করে আমাদের কোনো একজনকে গ্রহণ করো। কিন্তু সুকন্যা তাতে অসম্মতি জানালে অশ্বিনী কুমারদ্বয় বলেন যে, চ্যবন ও আমরা দু জন জলে ডুব দিয়ে সুন্দর রূপ লাভ করব। এর মধ্যে তুমি যাকে খুশি পতি হিসেবে গ্রহণ করবে। এই প্রস্তাবে সুকন্যা রাজি হলে অশ্বিনী কুমারদ্বয় চ্যবনকে সাথে নিয়ে জলে ডুব দিয়ে উঠলে চ্যবনের চেহারা সুন্দর হয়ে যায়, কিন্তু সুকন্যা তার স্বামীকে চিনতে সক্ষম হয় এবং তাকেই বরণ করে *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ১৯৪]* —

> অশ্বিনীকুমারদ্বয় বললেন, আমরা দেবচিকিৎসক, তোমার পতিকে যুবা ও রূপবান ক'রে দেব, তার পর তিনি এবং আমরা এই তিন জনের মধ্যে একজনকে তুমি পতিত্বে বরণ ক'রো। সুকন্যা চ্যবনকে জানালে তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ করলেন এবং মুহূর্তকাল পরে তিন জনেই দিব্য রূপ ও সমান বেশ ধারণ ক'রে জল থেকে উঠলেন।

'জলে ডুব দিয়ে রূপবতী / রূপবান হওয়া' পুরাণে উল্লেখিত এই বিষয়টি বাংলা রূপকথার কাহিনীতে স্থান লাভ করেছে।

'সুখু আর দুখু' গল্পে দুখু একটি অবহেলিত মেয়ে। বিমাতা তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। দুখুর মাও সতীনের নির্যাতনের শিকার। একদিন দুখুকে তার মা তুলা পাহারা দিতে বললে বাতাস কিছু তুলা উড়িয়ে দেয়। সেই তুলার খোঁজে দুখু চাঁদের বুড়ির কাছে পৌঁছায়। চাঁদের বুড়ি তাকে পুকুরে স্নান করে খেয়ে নিতে বললে দুখু তেল– ক্ষার মেখে পুকুরে ডুব দেয় এবং দেবকন্যার চেয়ে বেশি রূপবতী হয়। পরে তুলা নিয়ে সে মায়ের কাছে ফিরে আসে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার ১৪০০: ১১৬]* —

> ক্ষার খৈল টুকু মাখিয়া জলে নামিয়া দুখু ডুব দিল। ডুব দিতেই এক ডুবে দুখুর সৌন্দর্য উথ্‌লে পড়ে! সে কি রূপ! – অত রূপ দেবকন্যারও নাই! – দুখু তা' জানিতেও পারিল না। আর এক ডুবে দুখুর গয়না, – গায়ে ধরে না, পায়ে ধরে না।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব : মিথ-এর গল্পটি রূপকথায় বর্ণিত গল্পটিতে প্রভাব ফেলেছে। দেখা যায়, মিথ ও রূপকথা উভয় ক্ষেত্রেই পূর্বে খারাপ চেহারার জন্যে কষ্ট পাওয়া মানুষ পরবর্তীতে দৈবিকভাবে জলে ডুব দিয়ে অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী হয়ে সুখে বাস করতে থাকে।

পার্থক্য : বিষয়টিতে মিথ ও রূপকথার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। শুধু কালিক প্রেক্ষাপটের জন্যে এবং কাহিনীর ভিন্নতার কারণে বিষয়টির উপস্থাপনের ভিন্নতা দেখা যায়। এই পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, কেননা মহাকাব্য ও মানুষের মুখে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে গঠনশৈলীর পার্থক্য থাকবেই।

Dhaka University Institutional Repository

২২. শর্ত সাপেক্ষে বিবাহ

বাংলা রূপকথায় যে 'শর্ত সাপেক্ষে বিবাহ' বিষয়টি উল্লেখ করা আছে সেই একই ধরনের বিষয় মিথ-এর বিভিন্ন আখ্যান ও উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে। পুরাণে রাজকন্যার বিবাহের ক্ষেত্রে এ ধরনের শর্ত জুড়ে দেয়ার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

রামায়ণের বালকাণ্ডের ষটষষ্টিতম সর্গে সীতার পালক পিতা জনক পণ করেন যে, শিব দেবতাদের যে ধনুক দান করেছিলেন তাতে যে রাজপুত্র জ্যা আরোপণ করতে পারবে তাকে কন্যা দান করব। অনেক রাজপুত্র চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় তাই সীতার আর বিয়ে দেয়া হয় নি। সপ্তষষ্টিতম সর্গে ঋষি কৌশিক (বিশ্বামিত্র) বলেন, মহারাজ জনক আপনার হরকার্মুক প্রদর্শন করুন। ঋষির কথামতো রাজা হরকার্মুক প্রদর্শন করেন। তখন ঋষি বিশ্বামিত্রের কথা মতো রাম সেই ধনুকে প্রণাম করে অবলীলায় ধনুর মধ্য ভাগ গ্রহণ ও তাতে পুনঃ আরোপণ করলেন ফলে ধনু দ্বিখণ্ডিত হলো এবং শর্তানুযায়ী রামের সাথে রাজা জনক তাঁর কন্যা সীতাকে বিবাহ দিলেন *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ১০৫]* —

> অনন্তর আমি এই পণ করিলাম যে, যে ব্যক্তি এই হরকার্মুকে জ্যা আরোপণ করিতে পারিবেন, আমি তাঁহারেই এই কন্যা দিব।

'শর্ত সাপেক্ষে বিবাহ' পুরাণে উল্লেখিত এই বিষয়টি বাংলা রূপ কথার বিভিন্ন কাহিনীতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। বাংলা রূপকথায় রাজকন্যার বিয়ে নিয়ে যেসব গল্প প্রচলিত আছে তাতে 'শর্ত সাপেক্ষে বিবাহ' প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

'শীত-বসন্ত' গল্পে এক রাজকন্যা স্বয়ংবর অনুষ্ঠানের জন্যে সাজতে থাকলে, তার সোনার টিয়া পাখি বলে, 'রাজকন্যা গজমোতি ছাড়া তোমার সৌন্দর্য অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।' –এই কথা শুনে রাজকন্যা স্বয়ম্বরে না গিয়ে, বিবাহে শর্ত জুড়ে দেয়। যে রাজপুত্র তাকে গজমোতি এনে দিতে পারবে সে তাকে বিবাহ করবে। অনেক রাজপুত্র এতে ব্যর্থ হয়ে শর্তমতে রাজকন্যার নফর খাটতে থাকে, কিন্তু দুয়োরানির পুত্র, শীত রাজার ভাই, আশ্রয়বাসী বসন্ত কুমার ক্ষীরোদ সাগরের সাদা হাতির মাথা থেকে গজমোতি নিয়ে রাজকন্যাকে দিলে রাজকন্যা তার শর্ত অনুযায়ী বসন্তের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৪১-৪২]* —

> রাজকন্যার পণ, যে রাজপুত্র গজমোতি আনিয়া দিতে পারিবেন, রাজকন্যা তাঁহার হইবেন – না পারিলে রাজকন্যার নফর হইয়া থাকিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব : স্বয়ংবর একটি পৌরাণিক ও আর্য-সংস্কৃতির উপাদান। রূপকথার গল্পে তাই স্বয়বরের উল্লেখ নিঃসন্দেহে পুরাণ প্রভাবিত।

পার্থক্য : মূল বিষয় এক হলেও কাহিনী, চরিত্র এবং বর্ণনার ভিন্নতা লক্ষণীয়। রামায়ণের পিতার শর্ত কার্যকরী এবং সে শর্ত দেয়া হয়েছে অন্য কারও যুক্তিতে প্ররোচিত হয়ে নয়। এখানে মেয়ের মতামতের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু রূপকথার উৎকর্ষতা ভিন্ন। কেননা শর্ত আরোপ করে স্বয়ং কন্যা এবং তার মতামতই প্রধান। এভাবে মহাকাব্যের উপাদানে রচিত হলেও রূপকথাতে স্বকীয়তা রক্ষিত হয়েছে। রূপকথায় কন্যা স্বয়ংবরে বসলেও পূরাণে সীতার স্বয়ংবর বিবেচ্য ছিল না। পিতার প্রতিজ্ঞা পূরণই ছিল মূল বিষয়। তাই কাহিনীর ভিন্নতার দরুন এ ধরনের পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও সমরশক্তিসম্পন্ন রাজ্যের বর্ণনা

বাংলা রূপকথায় রাজার রাজ্য বর্ণনার ক্ষেত্রে যে ঐশ্বর্য ও সমরশক্তি বর্ণনার প্রবণতা লক্ষ করা যায় তা পুরাণ প্রভাবিত। পুরাণের বিভিন্ন আখ্যান ও উপাখ্যানে রাজার বল-বীর্য এবং রাজত্বের বর্ণনা করতে গিয়ে অপার ঐশ্বর্য ও বিপুল সমরশক্তির বর্ণনা করা হয়েছে।

রামায়ণের বালকাণ্ডে রাজা দশরথের রাজ্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই আখ্যানটিতে ঐতিহাসিকতা পাওয়া যায়। যেমন- পারস্য, সিন্ধু, কম্বোজ ইত্যাদি অঞ্চলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। দশরথের রাজত্ব ঐশ্বর্যে ভরপুর। বিভিন্ন উন্নত জাতের ঘোড়া, হাতি, মৃগ ইত্যাদিতে অযোধ্যা পরিপূর্ণ। সমরশক্তিতেও রাজ্যের বিশেষ সুনাম। কেউই অযোধ্যার সাথে যুদ্ধ করতে চাইত না, তাই ঐ রাজ্যের নাম অযোধ্যা রাখা হয়েছে। রামের পিতৃদেব মহারাজ দশরথ সাফল্যের সঙ্গে দেশ শাসন ও প্রজা প্রতিপালন করতেন। তাঁর একটিই সমস্যা ছিল। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞে করার ফলে তিনি সন্তান লাভ করেন *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ২১]*—

> গিরিদরী যেমন কেশরী দ্বারা পূর্ণ থাকে, সেইরূপ সেই অযোধ্যা নগরী হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী অকুটিল-স্বভাব অসহিষ্ণু ধনুর্বেদ-বিশারদ ও বীরগণে পরিপূর্ণ ছিল। কাম্বোজ বাহ্লীক ও পারস্য দেশীয় এবং সিন্ধু প্রদেশোৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ অশ্বসকল এবং বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্বতে জাত দিগ্‌গজ ঐরাবত মহাপদ্ম অঞ্জন ও বামনের কুলে উৎপন্ন ভদ্র, মন্দ্র ও মৃগ এই ত্রিবিধ জাতি সঙ্করজ ভদ্রমন্দ্র, মন্দ্রমৃগ ও মৃগমন্দ্র এই দ্বিবিধ দ্বিবিধ জাতি সঙ্করজ মদস্রাবী মহাবল শৈলের ন্যায় উত্তুঙ্গামাতঙ্গাসমূহে অযোধ্যা সততই পরিপূর্ণ থাকিত। কেহ তথায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, এই নিমিত্ত ঐ নগরীর নাম অযোধ্যা হইয়াছিল। উহার বিস্তার তিন যোজন, কিন্তু দুই যোজনের মধ্যে যুদ্ধার্থ কেহই সাহস করিতে পারিত না, শত্রু-নাশন রাজা দশরথ চন্দ্র যেমন নক্ষত্রগণকে শাসন করেন, সেইরূপ সেই যথার্থ-নামা সুদৃঢ় তোরণ ও অর্গলসম্পন্ন বিচিত্র গৃহ-পরিশোভিত বহুললোকসঙ্কুল ও মঙ্গালালয় অযোধ্যা শাসন করিতেন।

পুরাণ কাহিনীগুলোতে যেভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও সমরশক্তিসম্পন্ন রাজ্যের বর্ণনা করা হয়েছে ঠিক তেমনি বাংলা রূপকথাতেও রাজার রাজত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে ঐশ্বর্য ও সমরশক্তির বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলা রূপকথার গল্পগুলোর মধ্যে যেগুলো রাজা-বাদশাদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সেগুলোতে রাজ্যের বর্ণনায় এ বিশেষত্ব লক্ষণীয়।

'রাজকন্যা' গল্পে এক দেশের এক রাজার সাত রানি, রাজার রাজ্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তাঁর হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া মোতি, মোহর, সৈন্যসামন্ত কোনো কিছুর অভাব নেই। রাজার একটি মাত্র অভাব– তিনি নিঃসন্তান। নানা রকম যাগ-যজ্ঞ, পূজা-অর্চনা করেও কোন সন্তান হয় নি। তাই বিপুল ঐশ্বর্য ম্লান হয়ে গেছে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ১৪৫]* —

Dhaka University Institutional Repository

রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাডারে মাণিক, ঘরে ঘরে মোতি মোহরের হাট, শাস্ত্রী সিপাই সৈন্যে সামন্তে পূব দক্ষিণ উত্তর পশ্চিম জুড়ে রাজার রাজত্ব।

প্রভাব : রাজ্য বর্ণনার ধরন হিসেবে রূপকথায় যে রীতি অনুসরণ করা হয়েছে তা পুরাণ প্রভাবিত। পুরাণে যেভাবে সম্পদশালী রাজ্যের বর্ণনা করা হয়েছে রূপকথাতেও সেই রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

পার্থক্য : রাজ্যের ঐশ্বর্য ও সমরশক্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য দেখা যায় না। এমনকী রূপকথা ও পুরাণের দুই রাজারই ঐশ্বর্যের অভাব না থাকলেও তার প্রথমে নিঃসন্তান থাকেন এবং পরে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সন্তানের পিতা হন।

শুধু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ও রচনাশৈলীর কারণে বর্ণনার ক্ষেত্রে উপাদানের কমবেশি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. সন্ন্যাসী কর্তৃক নবজাতকের নামকরণ

বাংলা রূপকথায় 'সন্ন্যাসী কর্তৃক নবজাতকের নামকরণ'-এর যে বিষয়টি উল্লেখ করা আছে তা পুরাণের সাথে সাজুয্যপূর্ণ। পুরাণে দেখা যায়, রাজাদের সন্তান হলে সন্তানের নামকরণ বিষয়টি অনেক ঘটা করে করা হয় এবং ব্রাহ্মণ / সন্ন্যাসীরা নবজাতকের নামকরণ করেন।

রামায়ণের বালকাণ্ডে উল্লেখ আছে, মহারাজ দশরথের কোনো সন্তান না থাকায় তিনি ঋষি বশিষ্ঠের নির্দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ সফল হলে ইষ্ট দেবতা দশরথের তিন রানির জন্যে পায়েস পাঠান। দশরথ তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সেই পায়েস ভাগ করে দেন। রানিরা সেই পায়েস খেলে, বড়রানি কৌশল্যা ও কৈকয়ীর একটি করে পুত্র হয় এবং ছোট রানি সুমিত্রার দুটি পুত্র হয়। সন্তান হবার পরে ঋষি বশিষ্ঠ দ্বাদশ দিবসে তাঁদের নামকরণ করেন। তিনি কৌশল্যার পুত্রের নাম রাম, কৈকয়ীর পুত্রের নাম ভরত এবং সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের নাম লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রাখেন *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ৪১]*—

> অনন্তর একাদশ দিবস অতীত হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ হৃষ্টমনে রাজকুমারদিগের নামকরণ করিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত ও সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটির নাম লক্ষ্মণ আর একটির নাম শত্রুঘ্ন হইল।

'সন্ন্যাসী কর্তৃক নবজাতকের নামকরণ' পুরাণে উল্লেখিত এই বিষয়টি বাংলা রূপকথার কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। পুরাণে মানুষের যেসব মঙ্গাল ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে 'নামকরণ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা রূপকথায় যেসব কাহিনীতে রাজা–রানির উল্লেখ করা আছে তাতে সন্ন্যাসী কর্তৃক নবজাতকের নামকরণ বিশেষ স্থান লাভ করেছে।

'মধুমালা' গল্পে এক রাজার প্রচুর পরিমাণে ধনসম্পত্তি থাকলেও পুত্র না থাকার কারণে তার মনে কোনো শান্তি ছিল না। রাজ্যের প্রজারা রাজাকে আঁটকুড়ে বলতে লাগল। একদিন ভোরবেলায় রাজা ঘুম থেকে জেগে দেখেন ঝাড়ুদার ঝাঁট দিচ্ছে। তিনি কবাট দিতে গেলে ঝাড়ুদার খোলার-মালী রাজার মুখ দেখতে পেয়ে বারদেবতার স্মরণ করে। সে বলে, তার দিনটি ভাল যাবে না কারণ সকাল বেলায় আঁটকুড়ে রাজার মুখ দেখেছে। এ কথা শুনে রাজা দুঃখে ঘরের কবাট দেন। তখন দুয়ারী হিসেবে ছিলেন বিধাতা পুরুষ। তিনি সব দেখে নিজ রূপ পাল্টিয়ে সন্ন্যাসী রূপ ধারণ করে রাজার পুত্র হওয়ার উপায় বলে দেন। প্রথম উপায়টিতে রাজা ব্যর্থ হলে সন্ন্যাসী রাজাকে আর একটি উপায় বলে দেন। সেই উপায়ে রাজা সফল হলে সন্ন্যাসী বলেন, তোমার সুদর্শন পুত্র 'মদনকুমার' হবে। তিনি আরও বলেন, বারো বছর পর্যন্ত পুত্রটিকে চন্দ্র সূর্যের আলো থেকে দূরে রাখতে। এই বলে সন্ন্যাসী উধাও হয়ে যান। সময়ের ব্যবধানে সুদর্শন রাজপুত্র জন্ম গ্রহণ করলে সন্ন্যাসীর কথা মতো রাজা তাঁর পুত্রের নাম রাখেন 'মদনকুমার' *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৩২৫]*—

Dhaka University Institutional Repository

সন্ন্যাসী যে নাম বলিয়া গিয়াছেন, রাজপুত্রের নাম তাহাই হইল।

রাজা, নাম রাখিলেন – মদনকুমার।

প্রভাব : পুরাণে উল্লেখিত বিষয়টি রূপকথার গল্পে প্রভাব ফেলেছে। সন্ন্যাসী কর্তৃক নামকরণ আর্য সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। যেহেতু রূপকথায় পুরাণে উল্লেখিত আর্য-সংস্কৃতির এ বৈশিষ্টের সাদৃশ্য পাওয়া গেছে সেহেতু এটি পুরাণের প্রভাবেই হয়েছে বলা যায়।

পার্থক্য : মূল বিষয়ে কোনোরকম পার্থক্য নেই। শুধু কাহিনী, চরিত্রের উৎকর্ষতায় ভিন্নতা পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. দেবকারিগর বিশ্বকর্মার উল্লেখ

বাংলা রূপকথায় যে দেব কারিগর 'বিশ্বকর্মার' উল্লেখ করা আছে তা পৌরাণিক চরিত্র। বিশ্বকর্মা শুধু পৌরাণিক দেবতা নয়, বৈদিক দেবতাও বটে। পুরাণে দেবতাদের স্বর্গ নির্মাণ ও আরও অন্যান্য বিশাল ভবনের নির্মাণ প্রসঙ্গে দেবকারিগর বিশ্বকর্মার উল্লেখ পাওয়া যায়।

রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে মহাপুরী লঙ্কার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। লঙ্কার চারপাশের পরিখায় পদ্ম ফুল ফুটে আছে। খুবই মনোরম লঙ্কা নগরী। অনেক ধনুকধারী রাক্ষস লঙ্কার রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত। পর্বতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দূর থেকে দেখলে এটিকে গগনচুম্বী মনে হয়। দেব কারিগর বিশ্বকর্মা স্বযত্নে এটি নির্মাণ করেছেন *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ৫২৮]*—

> মহাপুরী লঙ্কা উৎপলশোভী পরিখায় বেষ্টিত। নিশাচারগণ সীতাপহরণ অবধি রাবণের নিয়োগে উহারা রক্ষাবিধানার্থ ধনুধারণপূর্বক চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। ঐ পুরী অতিশয় রমণীয়; উহা কনকময় প্রাকারে পরিবৃত, অত্যুচ্চ সুধাধবল গৃহ এবং পাণ্ডুবর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথে শোভিত আছে। উহার ইতস্ততঃ পতাকা এবং লতাকীর্ণ স্বর্ণময় তোরণ। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ঐ পুরী বহুপ্রযত্নে নির্মাণ করিয়াছেন। যেমন গিরিগুহা উরগে, সেইরূপ উহা ঘোররূপ রাক্ষসে পূর্ণ হইয়া আছে। ঐ নগরী পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দূর হইতে বোধ হয়, যেন গগনে উড্ডীন হইতেছে।

দেবকারিগর 'বিশ্বকর্মা' পুরাণে উল্লেখিত এই চরিত্রটি বাংলা রূপকথার গল্পে স্থান লাভ করেছে। বাংলা রূপকথার যে গল্পে বিশালায়তন রাজপ্রাসাদের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে দেবকারিগর বিশ্বকর্মা প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

'কিরণমালা' গল্পে অরুণ, বরুণ ও কিরণ ব্রাহ্মণের তিন ছেলে-মেয়ে। অরুণ-বরুণের ছোট বোন কিরণ। একদিন তাদের দেশের রাজাকে তারা জল দিয়ে প্রাণে বাঁচায়। রাজা তাদের বলেন, যদি কোনো দিন প্রয়োজন পড়ে তো আমাকে জানাবে। কিরণ তার দাদার কাছে রাজার কী থাকে জানতে চাইলে অরুণ-বরুণ বলে, পুঁথিতে আছে রাজার হাতি, ঘোড়া, অট্টালিকা থাকে। তখন কিরণ বলল, হাতি ঘোড়া কোথায় পাই; তোমরা অট্টালিকা বানাও। তখন অরুণ-বরুণ বোনের জন্যে দিনরাত পরিশ্রম করে নানা উপাদানে বারোমাস ছত্রিশ দিনে যে বিশাল অট্টালিকা বানায় তা দেখে দুঃখে ময়দানব উপোস করে এবং বিশ্বকর্মা ঘর ছাড়ে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৫৫]* —

> সে অট্টালিকা দেখিয়া ময়দানব উপোস করে, বিশ্বকর্মা ঘর ছাড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব : বিশ্বকর্মা ও ময়দানব পৌরাণিক চরিত্র। রূপকথাতে যে বিশ্বকর্মা ও ময়দানবের কথা বলা হয়েছে তাও পৌরাণিক প্রভাবে প্রভাবিত। পুরাণে বিশ্বকর্মার নির্মাণ কুশলতা আলোচিত হয়েছে এবং রূপকথাতেও যেভাবে বিশ্বকর্মার উল্লেখ আছে তা পরোক্ষভাবে বিশ্বকর্মার নির্মাণ কুশলতারই পরিচায়ক।

পার্থক্য : রূপকথার বিশ্বকর্মা ও মিথ-এর বিশ্বকর্মা একই। তাঁর একই গুণের কথা রূপকথাতে ও পুরাণে আলোচিত হলেও পুরাণে বিশ্বকর্মা নিজে ভবন নির্মাণ করেছেন, কিন্তু রূপকথায় তিনি অন্যের নির্মিত ভবনের সৌন্দর্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে ঘর ছেড়েছেন।

রূপকথাতে কাহিনীর সৌন্দর্য পরিস্ফূটনের জন্যে তুলনা বোঝাতে বিশ্বকর্মার কথা বর্ণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. গগনচুম্বী রাজপুরী

বাংলা রূপকথাতে গগনচুম্বী রাজপুরীর যেভাবে বর্ণনা করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে পুরাণেও একই ভঙ্গিতে বিভিন্ন আখ্যান ও উপাখ্যানে রাজপুরীর বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত পুরাণের প্রভাবে রূপকথাগুলোতে বিষয়টি স্থান লাভ করেছে। রূপকথাতে যেমন কোনো জিনিসকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করে তার সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করা হয়, পুরাণেও নানা বিশেষণযোগে রাজপুরীর বর্ণনা আছে।

রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে রাক্ষসরাজ রাবণের মহাপুরী লঙ্কার বর্ণনা করা হয়েছে। লঙ্কার চারিপাশে যে পরিখা তাতে পদ্ম শোভা পায়। সীতাকে অপহরণের পর থেকে নিশাচরগণ ধনুক হাতে তার রক্ষণাবেক্ষণ করছে। সেই রাজপুরী বিভিন্ন উন্নত মানের শৈল্পিক ধাতব ও পাথর দ্বারা সজ্জিত। লঙ্কার রাস্তা প্রশস্ত। লঙ্কার ফটক সোনার তৈরি। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা অনেক যত্নে এর নির্মাণ করেছেন। বহু রাক্ষস এই রাজপুরীতে বাস করে। পর্বতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দূর থেকে দেখলে এটি গগণচুম্বী মনে হয় *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ৫২৮]* —

> মহাপুরী লঙ্কা উৎপলশোভী পরিখায় বেষ্টিত। নিশাচরগণ সীতাপহরণ অবধি রাবণের নিয়োগে উহার রক্ষাবিধানার্থ ধনুর্ধারণপূর্বক চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। ঐ পুরী অতিশয় রমণীয়; উহা কনকময় প্রাকারে পরিবৃত, অত্যুচ্চ সুধাধবল গৃহ এবং পাণ্ডুবর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথে শোভিত আছে। উহার ইতস্ততঃ পতাকা এবং লতাকীর্ণ স্বর্ণময় তোরণ। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ঐ পুরী বহুপ্রযত্নে নির্মাণ করিয়াছেন। যেমন গিরিগুহা উরগে, সেইরূপ উহা ঘোররূপ রাক্ষসে পূর্ণ হইয়া আছে। ঐ নগরী পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দূর হইতে বোধ হয়, যেন গগনে উড্ডীন হইতেছে।

পুরাণ কাহিনীগুলোতে কোনো বিখ্যাত রাজপুরীর বর্ণনা যেভাবে করা হয়েছে, তেমনভাবে বাংলা রূপকথাগুলোতেও রাজপুরীর বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলা রূপকথায় যেভাবে রাজপুরীর বর্ণনা করা হয়েছে তা পুরাণ প্রভাবিত।

'ঘুমন্ত-পুরী' গল্পে কোনো এক দেশের রাজকুমারের সৌন্দর্যে রাজপুরী আলো হয়ে থাকে। একদিন রাজকুমার দেশ ভ্রমণে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তাতে প্রজা ও রানি মন খারাপ করলেও রাজা তাকে যেতে বললেন। রাজা রাজকুমারের সাথে সৈন্যসামন্ত, চর, অনুচর দিলেন; রানি দিলেন মণি-মাণিক্যের ডালা। রাজপুত্র এ সবকিছু নিলেন না। যেতে যেতে অনেক দূরে এসে তিনি এক রাজপুরী দেখতে পেলেন। রাজপুত্র অবাক হয়ে গেলেন। সেই বিশাল রাজপুরীর ফটকের চূড়া আকাশে ঠেকেছে। কিন্তু ফটকের চূড়ার বাদ্যযন্ত্র বাজে না, কারণ তা ছিল ঘুমন্ত পুরী *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ২১]* —

Dhaka University Institutional Repository

চলিতে চলিতে, অনেক দূর গিয়া রাজপুত্র দেখেন, বনের মধ্যে এক যে রাজপুরী-রাজপুরীর সীমা। অমন রাজপুরী রাজপুত্র আর কখনও দেখেন নাই! দেখিয়া রাজপুত্র অবাক্ হইয়া রহিলেন।

রাজপুরীর ফটকের চূড়া আকাশে ঠেকিয়াছে। ফটকের দুয়ার বন জুড়িয়া আছে। কিন্তু ফটকের চূড়ায় বাদ্য বাজে না, ফটকের দুয়ারে দুয়ারী নাই।

প্রভাব : রূপকথার রাজপুরী পৌরাণিক না হলেও এগুলোর বর্ণনা পুরাণে উল্লেখিত রাজপুরীর মতো। বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ-এর প্রভাব লক্ষণীয়।

পার্থক্য : উভয়ক্ষেত্রে গগনচুম্বী রাজপুরীর বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণে নির্দিষ্ট করে পুরীর নামোল্লেখ থাকলেও রূপকথায় কোনো নির্দিষ্ট পুরীর কথা বলা হয় নি। শুধু রাজপুরীর বর্ণনার ক্ষেত্রে মিল দেখা গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৭. রাক্ষস কর্তৃক রাজ্য উজাড়

'রাক্ষস কর্তৃক রাজ্য উজাড়' প্রসঙ্গটি রূপকথায় যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তেমনভাবে পুরাণেও উল্লেখ করা আছে। মিথ-এ যেখানে রাক্ষসের ভয়ানক ক্ষমতার উল্লেখ আছে, সেখানে রাজ্য উজাড় কিংবা অন্য রাজ্য হস্তগত করার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

রামায়ণের বালকাণ্ডে ঋষি বিশ্বামিত্র যখন দশরথ– নন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে তাঁর আশ্রমে যাচ্ছিলেন তখন তিনি বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা দেন। এক ভয়ংকর বন দেখে রাম ও লক্ষ্মণ তা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অতিশয় ঐশ্বর্যমণ্ডিত মলদ ও করূষ রাজ্য রাক্ষস মারীচের মা তাড়কার অত্যাচারে বিনষ্ট হয়ে বনে পরিণত হয়েছে *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ৫০]*—

> বৎস! বহুদিন অবধি এই মলদ ও করূষ ধনধান্যসম্পন্ন অতি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। তৎপরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাড়কা নাম্নী কামরূপিণী দুষ্টচারিণী এক যক্ষী এই জনপদ বিনষ্ট করে। ঐ তাড়কা সুন্দের ভার্যা। সে স্বয়ং সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে। ইহার পুত্রের নাম মারীচ। এই মারীচের বাহুযুগল বর্তূলাকার, মস্তক সুপ্রশস্ত, আস্যদেশ বিশাল ও শরীর সুদীর্ঘ। এই বিকট-দর্শন রাক্ষস সততই প্রজাগণের মনে ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে।

'রাক্ষস কর্তৃক রাজ্য উজাড়' পুরাণে উল্লেখিত এ বিষয়টি বাংলা রূপকথার কাহিনীতে পাওয়া যায়। রাজা-রানি ও রাক্ষসের শত্রুতা বিষয়ক কাহিনীতে এ প্রসঙ্গটি বর্ণিত হয়েছে।

নীলকমল আর লালকমল গল্পে রাজার দুই রানি, যার মধ্যে একজন রাক্ষসী। তার লোলুপ দৃষ্টির কারণে লক্ষ্মী রানি মৃত্যুবরণ করেন। তারপর রাক্ষসী নিজের পুত্র ও সতীনের পুত্রকে খেয়ে ফেলে এবং একটি সোনার ও একটি লোহার ডেলা উগরে দেয়। ছাদের ওপরে যেখানে রাক্ষসের হাট সেখানে রাক্ষসী রানি সোনার ও লোহার ডেলা দুটিকে নিয়ে ওঠে এবং রাক্ষসদের নিজেদের দেশে যেতে বলে। রাক্ষসরা যাওয়ার সময় রাজ্যের অনেক প্রজা হত্যা করে খেয়ে চলে যায়। পরের দিন প্রত্যেক বাড়ি থেকে মানুষের হাড় পাওয়া যায়। এমন ভয়ানক কাণ্ড দেখে জীবিত প্রজারাও রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে থাকে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৬৮]* —

> পরদিন, রাজ্যে হুলুস্থূল। ঘরে ঘরে মানুষের হাড়, পথে পথে হাড়ের জাঙ্গাল! রাক্ষসে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, আর রক্ষা নাই। যখন সকলে শুনিল, রাজপুত্রদিগেও খাইয়াছে, তখন জীবন্ত মানুষ দলে–দলে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।
>
> রাজা বোকা হইয়া রহিলেন; রাজা রাজত্ব রাক্ষসে ছাইয়া গেল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব : রূপকথার গল্পটিতে মিথ-এর প্রভাব দেখা যায়। রাজ্যে রাক্ষসের আক্রমণের ফলাফল হিসেবে উভয় ক্ষেত্রে রাজ্য উজাড় হয়েছে এবং রাক্ষসের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পার্থক্য : রূপকথায় রাক্ষসের নর-মাংসের প্রতি লোভের কারণে মানুষ হত্যা করা হয়েছে এবং সে কারণে রাজ্য উজাড় হয়েছে, কিন্তু মিথ-এ রাক্ষস তার বিকট রূপ দেখিয়ে প্রজাদের মনে ভয় উৎপন্ন করে রাজ্য ছাড়া করেছে। রূপকথায় রাক্ষসী স্বয়ং রানি হলেও মিথ-এ তেমনটি দেখা যায় নি। মূল বিষয় ঠিক একই হলেও কাহিনীর সূত্রপাত ও অনুষজ্ঞা ভিন্ন হওয়ার কাহিনীর বর্ণনায় কিছুটা ভিন্নতা দেখা গেছে।

রূপকথা ও পুরাণের গঠনশৈলী এবং কাহিনীর বিন্যাসের দরুন এ ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. সন্তান লাভের আশায় যজ্ঞানুষ্ঠান

রূপকথায় বর্ণিত 'সন্তান লাভের আশায় যজ্ঞানুষ্ঠান' প্রসঙ্গটি পুরাণের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মিথ-এর কাহিনীতে সন্তান কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামায়ণের বালকাণ্ডে সূর্যবংশীয় দশরথ অতিশয় ধনী রাজা হলেও নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি নানা চিন্তা করে সন্তান কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্যে মনস্থির করেন। ঋষি বশিষ্ঠের সহায়তায় অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হলে তিনি আরাধ্য দেবতার কাছে সন্তান কামনা করেন। তখন দেবতা তাকে এক বাটি পায়েস দিলে তিনি তার তিন রানির মধ্যে তা ভাগ করে দেন। কিছু দিন পর তিন রানির চার পুত্র সন্তান হয় *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ২৩]*—

> ঈদৃশপ্রভাবসম্পন্ন ধর্মপরায়ণ মহাত্মা দশরথ সন্তান কামনায় নিরন্তর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তথাচ বংশদর পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে সমর্থ হন নাই। একদা তিনি এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন, এক্ষণে সন্তানার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য হইতেছে। অন্তর সেই ধীমান, স্থিরচিত্ত অমাত্যগণের সহিত এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া মন্ত্রি-প্রধান সুমন্ত্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি অবিলম্বে গুরু ও পুরোহিতগণকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সত্বরে সুখজও, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণগণ আনয়ন করিলেন। রাজা দশরথ তাঁহাদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিয়া ধর্মার্থসঙ্গত মধুর বাক্যে কহিলেন, তপোধনগণ! আমি পুত্রের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছি, কিছুতেই আমার সুখ নাই; এক্ষণে বাসনা যে, আমি সন্তান কামনায় এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করি। হে ব্রাহ্মণগণ! আমি শাস্ত্রবিহিত বিধি অনুসারে যজ্ঞ সাধন করিব। এক্ষণে কিরূপে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে আপনারা তাহা অবধারন করুন।

'সন্তান লাভের আশায় যজ্ঞানুষ্ঠান' পুরাণে উল্লেখিত এই বিষয়টি বাংলা রূপকথার কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। বাংলা রূপকথায় সাধারণত রাজা-বাদশাদের কাহিনী যে গল্পে বর্ণিত সেখানে রাজার সম্পদের আতিশয্য থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের একটি অভাব লক্ষণীয় — সন্তানের। তাই বাংলা রূপকথায় সন্তান লাভের আশায় যজ্ঞানুষ্ঠান প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

'মালঞ্চমালা' গল্পে একটি নিঃসন্তান রাজা পুত্র কামনায় ঋষি, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসীদের এনে মহাসমারোহে যাগ-যজ্ঞ দিলেন। যাগ-যজ্ঞ সমাপন হলে দৈববাণীতে রাজাকে জানানো হয় যে, তিন দিন উপোস থাকার পর মালঞ্চে সোনার বরণ আমের জোড়া থেকে বামের আমটি খাবে রানি এবং ডানের আমটি খাবে রাজা তবেই তাদের সন্তান হবে। তখন রাজা বিভিন্ন চেষ্টায় আম পাড়তে ব্যর্থ হলেও কোটালের সাহায্যে তা সম্ভব হয়। বাড়ি ফেরার পথে আম মাটিতে পড়ে গেলে চিনতে না পেরে রাজা বামের আম এবং রানি ডানের আমটি খান। দশ মাস গেলে রাজার অনিন্দ্যসুন্দর সন্তান জন্মগ্রহণ করে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৩৬৯]*—

Dhaka University Institutional Repository

এক রাজা।

রাজা নিঃসন্তান।

পুত্র কামনায়, রাজা, যোগী জ্যোতিষী যত ব্রাহ্মণ পন্ডিত সাধু সন্ন্যাসী আনাইয়া, 'সমারোহ' করিয়া যাগ-যজ্ঞ দিলেন।

প্রভাব : রূপকথার গল্পটিতে মিথ-এর প্রভাব লক্ষণীয়। মূল বিষয় এবং কাহিনীর বিন্যাস অনেকটা একই ধরনের। যজ্ঞের উদ্দেশ্য এবং যজ্ঞের ফলাফলও এক। উভয় ক্ষেত্রে রাজা বিত্তবান হলেও নিঃসন্তান এবং যজ্ঞের উদ্দেশ্য সন্তান ও যজ্ঞের ফলাফল সন্তান প্রাপ্তি।

পার্থক্য : বিষয়টিতে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. ক্ষীর সাগর

বাংলা রূপকথায় 'ক্ষীর সাগর'-এর যে বিষয়টি উল্লেখ আছে একই ধরনের প্রসঙ্গ মিথ-এর আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে। মিথ-এ মুনিদের উপাখ্যান বর্ণনা প্রসঙ্গে ক্ষীর সাগর বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত।

মহাভারতের উদ্‌যোগপর্বে দুর্যোধন নিজেকে খুবই পরাক্রমশালী ভাবতে থাকলে মহর্ষি কন্ব তাঁকে একটি উপাখ্যান শোনান। তিনি বলেন, ইন্দ্রসারথি মাতলির একটি সুন্দীর মেয়ে ছিলেন। তার নাম গুণকেশী। মাতালি তাঁর কন্যার জন্যে যোগ্য বর খুঁজতে থাকলে নারদ তাঁকে নাগলোক, দৈত্যলোক, পক্ষীলোক, এবং সর্পলোকে নিয়ে যায়। এসব বিভিন্ন স্থানে যাবার পথে নারদ মাতলিকে সপ্তম পৃথিবীতলে নিয়ে যান যেখানে গোমাতা সুরভি বাস করেন। যাঁর ক্ষীরধারা থেকে ক্ষীরোদ সাগরের উৎপত্তি *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ৩৩৭]*—

> নারদ তাঁকে রসাতল নামক সপ্তম পৃথিবীতলে নিয়ে গেলেন, যেখানে গোমাতা সুরভি বাস করেন, যাঁর ক্ষীরধারা থেকে ক্ষীরোদ সাগরের উৎপত্তি।

'ক্ষীরোদ সাগর' (ক্ষীর সাগর) পুরাণে উল্লেখিত এই বিষয়টি বাংলা রূপকথার কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। রাজপুত্রের অ্যাডভেঞ্চারমূলক কাহিনীতে ক্ষীর সাগর প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে স্থান লাভ করেছে।

'শীত-বসন্ত' গল্পে এক রাজকন্যা স্বয়ম্বরের জন্যে সাজতে থাকলে তার সোনার টিয়া পাখি বলে, 'যদি গজমোতি না পড়লে তবে তোমার সৌন্দর্য অসম্পূর্ণ রইল।' তখন রাজকন্যা স্বয়ম্বর না করার ঘোষণা দেন। রাজসভায় খবর যায়, যে রাজপুত্র গজমোতি এনে দিতে পারবে সেই রাজপুত্রকেই রাজকন্যা বরণ করবেন। আর তা না পারলে তাকে রাজকন্যার নফর করে রাখবেন। রাজপুত্রেরা সমুদ্র তীরের হাতির মাথার মোতি আনতে ব্যর্থ হলে রাজকন্যা তাদের নফর করে রাখেন। কিছুদিন পর মুনির আশ্রিত বসন্ত শুক ও সারীর কথোপকথনের মাধ্যমে গজমোতি, ক্ষীর সাগর ও রাজকন্যা প্রসঙ্গে জানতে পারেন। বসন্ত মুনিকে সব কথা বলে তার ত্রিশূল চাইলে মুনি তার ত্রিশূল দিয়ে দিন। তার পর একটি শিমুল গাছের কাছে বসন্ত বস্ত্র ও রাজমুকুট চাইলে, শিমুল গাছ তা দিয়ে দেয়। তখন বসন্ত ক্ষীর সাগরের লক্ষ লক্ষ সোনার পদ্মের মধ্যে বিচরণরত সাদা হাতির মাথার গজমোতি আহরণ করে নিয়ে রাজকন্যার কাছে এলে রাজকন্যা তাকে বিয়ে করেন *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৪৩]* —

> বৃক্ষ বসন্তকে কাপড়-চোপড় আর রাজমুকুট দিল। বসন্ত বাক্‌ল ছাড়িয়া কাপড়-চোপড় পরিলেন; রাজমুকুট মাথায় দিলেন। দিয়া, বসন্ত, ক্ষীর-সাগরের উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব : রূপকথার গল্পটিতে সরাসরি মিথ-এর প্রভাব লক্ষণীয়। ক্ষীর সাগর মিথ-এ বর্ণিত একটি সাগর, যার অস্তিত্ব মর্ত্যলোকে নেই। সুতরাং রূপকথায় বর্ণিত ক্ষীর সাগরের নাম এবং তার বর্ণনা মহাভারতের ক্ষীরোদ সাগরের সাথে তুলনীয়।

পার্থক্য : শুধু কাহিনীর ভিন্নতা ব্যতিত মূল বিষয়ে কোনোরকম মৌলিক পার্থক্য নেই। তবে কাহিনীর ভিন্নতার দরুন রূপকথায় ক্ষীর সাগরের বর্ণনা বেশি করা হলেও মিথ-এ ক্ষীরোদ সাগরের উৎপত্তির বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩০. রাক্ষস-রাক্ষসীর মানব-রূপ ধারণ

রাক্ষস-রাক্ষসীর মানব রূপ ধারণ মিথ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কখনও কখনও রাক্ষস-রাক্ষসীরা মানব রূপ ধারণ করে কাহিনীর মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

হিড়িম্ব ও হিড়িম্বা নামের দুই রাক্ষস-রাক্ষসী মিথ-এর গুরুত্বপূর্ণ দুটি চরিত্র। বারাণাবতে জতুগৃহদাহের পরে কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডব এক গভীর অরণ্যে উপস্থিত হলে সেখানকার এক শালগাছের ওপর হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ও তার বোন হিড়িম্বা নামে এক রাক্ষসী বাস করত। হিড়িম্ব পাণ্ডবদের দেখে হিড়িম্বাকে বলে, তুমি ওদের বধ করে নিয়ে এস আজ আমরা প্রচুর নর-মাংস খাব। ভ্রাতার কথা শুনে হিড়িম্বা সেখানে উপস্থিত হয় কিন্তু ভীমকে দেখে ভীমের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে। তারপর সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করে ভীমের সামনে উপস্থিত হয় *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ৬৬]* —

> ভ্রাতার কথা শুনে হিড়িম্বা গাছের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে পাণ্ডবদের কাছে এসে দেখলে সকলেই নিদ্রিত, কেবল একজন জেগে আছেন। ভমিকে দেখে সে ভাবলে, এই মহাবাহু সিংহাস্কন্ধ উজ্জ্বলকান্তি পুরুষই আমার স্বামী হবার যোগ্য।
>
> আমি ভ্রাতার কথা শুনব না, ভ্রাতৃস্নেহের চেয়ে পতিপ্রেমই বড়। কামরূপিণী হিড়িম্বা সুন্দরী সালংকারা নারীর রূপ ধারণ করে যেন লজ্জায় ঈষৎ হেসে ভীমসেনকে বললে, পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন?

হিড়িম্বার দেরী দেখে হিড়িম্ব সেখানে এসে উপস্থিত হয়। সে নিজেও বোনের মূর্তি দেখে বিস্মিত হয় *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ৬৭]* —

> হিড়িম্ব এসে দেখলে, তার ভগিনী সুন্দরী নারীর রূপ ধরে সূক্ষ্ম বসন, অলংকার এবং মাথায় ফুলের মালা পরেছে।

রাক্ষস-রাক্ষসী রূপকথা অঞ্চলের একটি বিশাল জায়গা দখল করে আছে। রাক্ষস-খোক্ষসদেরকে নিয়ে বিভিন্ন বিচিত্র ঘটনা রূপকথার একটি উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ। বিভিন্ন ঘটনার বিচিত্র প্রকাশে বাংলা পুরাণ কাহিনীতেও দখল করে আছে রাক্ষস-রাক্ষসীর বহুবিধ বিচিত্র অবস্থান। মিথ-এ যেভাবে রাক্ষস-খোক্ষসেরা মানুষের রূপ ধারণ করে কাহিনীকে বহুমুখী করেছে রূপকথাতেও সেভাবে এই রাক্ষস-রাক্ষসীরা মানব-মানবী রূপ ধারণ করে কাহিনীকে করে তুলছে বিচিত্রমুখী। মিথ-এ প্রচলিত রাক্ষসের মানব রূপ ধারণ সম্পর্কিত এ বিষয়টি বহু রূপকথাকেও প্রভাবিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

'নীলকমল আর লালকমল' রূপকথাটির মূল কাহিনী বর্ণিত হয়েছে রাক্ষস-রাক্ষসীকে আশ্রয় করে। এ কাহিনীতে রাজার দুই রানি। দুই রানির মধ্যে এক রানি যে রাক্ষসী এ কথা কেউই জানে না। রাক্ষসী মানবীর রূপ ধারণ করে রাজার রানি হয়ে দিনযাপন করছে বহুকাল ধরে। লক্ষ্মী মানুষ রানির ছেলে কুসুমকে খাওয়ার জন্যে রাক্ষসী রানি সারক্ষণই জল্পনা কল্পনা আঁটে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৬৫]* —

> এক রাজার দুই রানি; তাহার এক রানি সে রাক্ষসী! কিন্তু এ কথা কেহই জানে না। দুই রানির দুই ছেলে; — লক্ষ্মী রানির ছেলে কুসুম, আর রাক্ষসী রানির ছেলে অজিত।

পরে বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে রাক্ষসী রানির মৃত্যু হয় এবং রাজা মানুষ রানি তার পুত্র আর রাক্ষসী রানির পুত্র ও পুত্রবধুদের নিয়ে সুখে দিনযাপন করতে শুরু করে।

'ডালিম কুমার' গল্পের রানির আয়ু এক জোড়া পাশার মধ্যে প্রোথিত থাকে। এ কথা কেউ না জানলেও রাজপুরীর তালগাছে বসবাসরত রাক্ষসী ঠিকই জানে। রাজা রানিকে রেখে একদিন মৃগয়ায় গেলে রাক্ষসী এই সুযোগে রাজপুত্রের কাছে ভিখারিনী সেজে পাশা জোড়া চায়। রাজপুত্র হেলায় পাশা জোড়া দিয়ে দিলে রাক্ষসী রানির আয়ু-পাশা কোনো এক রাজ্যে পাঠিয়ে রানিকে খেয়ে রানির মূর্তি ধরে রাজার অপেক্ষা করে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৭৯]* —

> রাক্ষসী তাড়াতাড়ি গিয়া রানিকে খাইয়া রানির মূর্তি ধরিয়া বসিয়া রহিল।

আবার এ গল্পেই সাত রাক্ষসী পাশাবতী নামে মানবী সেজে রাজার সাত রাজপুত্রকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ জানায়। রাজপুত্র প্রথম দিন হেরে গেলে পাশাবতীর সাত বোন সাত রাজপুত্রের পক্ষিরাজ খেয়ে আবার রূপসী মূর্তি ধরে বসে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৮১]* —

> পাশাবতীর পুরে পাশাবতী দুয়ারে শিান উড়াইয়া ঘরকুঠরী সাজাইয়া, সাজিয়া, বসিয়া আছে। যে আসিয়া পাশা খেলিয়া হারাইতে পারিবে, আপনি আপনার ছয়বোন নিয়া তাহকে বরণ করিবে।

'সোনার কাঠী রূপার কাঠী' গল্পে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরপুত্র আর কোটালপুত্র চার বন্ধু মিলে দেশ ছেড়ে এক তেপান্তরের মাঠের সীমানায় উপস্থিত হয়। এখানে এক বিকট মূর্তি রাক্ষসীর কবলে পড়ে তারা। রাজপুত্র ছাড়া অন্যদের সবাইকে রাক্ষসী খেয়ে ফেলে। রাজপুত্র পালিয়ে এক রাজার রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজার রাজ্যে গেলেও রাক্ষসী তার পিছু ছাড়ে না। পরে এক সত্যকালের বৃক্ষ রাক্ষসীর হাত থেকে

Dhaka University Institutional Repository

রাজপুত্রকে রক্ষা করে তার ভেতরে স্থান দেয়। রাক্ষসী তখন এক রূপসী নারীর মূর্তি ধারণ করে গাছের তলায় বসে কাঁদতে থাকে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৯৭]*—

> রাক্ষসী গাছকে কত অনুনয় বিনয় করিল, কত ভয় দেখাইল, গাছ কিছুই শুনিল না। তখন রাক্ষসী এক রূপসী মূর্তি ধরিয়া সেই গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই দেশের রাজা, বনে শীকার করিতে আসিয়াছেন। কান্না শুনিয়া রাজা বলিলেন,– "দেখ তো, বনের মধ্যে কে কাঁদে?" লোকজন আসিয়া দেখে, আমগাছের নীচে এক পরমা সুন্দরী মেয়ে।

প্রভাব : রাক্ষস-রাক্ষসীর মানব মূর্তি ধারণ বিষয়টি পৌরাণিক। রূপকথায় এ ধরনের কাহিনীতে পুরাণের প্রভাব দেখা যায়। পুরাণ এবং রূপকথা দুটোতেই এই রূপ ধারনের ক্ষেত্রে মানুষের মাংসের লোভ ও বিবাহ বিষয় দুটি জড়িত।

পার্থক্য : পুরাণ প্রভাবিত হওয়ার কারণে রূপকথার কাহিনীগুলোও অনেকটা পৌরাণিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাহিনীর বর্ণনার পার্থক্য ও চরিত্রের ভিন্নতা ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই।

প্রভাব থাকলেও কাহিনীর ভিন্নতা থাকলে এ ধরনের পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. মৃগয়া

বাংলা রূপকথার কাহিনীগুলোতে যে 'মৃগয়া' প্রসঙ্গটি উল্লেখ হয়েছে তা পুরাণের সাথে সাজুয্যপূর্ণ । রাজা ও রাজন্যবর্গের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে 'মৃগয়া' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিথ-এর কাহিনীতে প্রসঙ্গটি আখ্যানে নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে সহায়তা করেছে।

মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাজা দুষ্মন্ত একবার প্রভূত সেনা নিয়ে মৃগয়ায় যান। তিনি পশু শিকার করে শ্রান্ত হয়ে পড়েন। সেখানে তিনি এক মুনির আশ্রম দেখতে পান এবং পরে সেখানে অপ্সরা কন্যা শকুন্তলার সাথে তাঁর পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয় ঘটে *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ৩৪]*—

> একদা দুষ্মন্ত প্রভূত সৈন্য ও বাহন নিয়ে গহন বনে মৃগয়া করতে গেলেন। বহু পশু বধ ক'রে তিনি একাকী অপর এক বনে ক্ষুৎপিপাসার্ত ও শ্রান্ত হয়ে উপস্থিত হলেন।

মহাভারতের বনপর্বেও এ ধরনের বিষয়ের উল্লেখ আছে। ভীমসেন মৃগয়ায় গিয়ে অনেক হরিণ, শূকর ও মহিষ হত্যা করে ফিরবার সময় এক অজগর সাপ তাঁকে বেষ্টন করে ফেলে। পরে অবশ্য যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের উপস্থিতিতে সাপ ভীমসেনকে ছেড়ে দেয় এবং স্পর্শরূপধারী নহুষ পুনরায় নিজরূপ ফিরে পায় *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ২১৪]* —

> দ্রৌপদী বললেন, তিনি বহুক্ষণ পূর্বে মৃগয়া করতে গেছেন। যুধিষ্ঠির ধৌম্যকে সঙ্গে নিয়ে ভীমের অন্বেষণে চললেন। মৃগয়ার চিহ্ন অনুসরণ করে তিনি এক পর্বতকন্দরে এসে দেখলেন, এক মহাকায় সর্প ভীমকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে, তাঁর নড়বার শক্তি নেই।

রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডে বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে বলেন, অনেক রাক্ষস আছে যারা ছলনা করে অন্যদের হত্যা করে। মারীচ তেমনি অতি কপট এক রাক্ষস। সে মৃগ রূপ ধারণ করে যে সমস্ত রাজা মৃগয়ায় আসেন তাঁদের হত্যা করে। রাম ও লক্ষ্মণ একটি স্বর্ণ মৃগ দেখলে বিশ্বামিত্র বললেন, এই মৃগ সেই মারীচ হতে পারে *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ৩৬৮]*—

> যে-সমস্ত রাজা মৃগয়াবিহারার্থ পুলকিতমনে অরণ্যে আইসেন, ঐ দুরাত্মা এইরূপ মৃগরূপ ধারণ করিয়া, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজাদের পশু শিকার তথা 'মৃগয়া' পুরাণে উল্লেখিত এই বিষয়টি বাংলা রূপকথার বিভিন্ন কাহিনীতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। বাংলা রূপকথার রাজা-রানিদের নিয়ে যেসব গল্প প্রচলিত আছে তাতে মৃগয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।

'শীত-বসন্ত' গল্পে দুয়োরানির দুই পুত্র শীত ও বসন্ত। তারা বিমাতা কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে নির্বাসনে যায়। কিন্তু একটি গাছতলায় বিশ্রামকালে দুর্ভাগ্যক্রমে দুই ভাই আলাদা হয়ে যায়। শীত এক দেশের রাজা হয়। পুরাণে উল্লেখিত রাজাদের মতো পরবর্তীতে শীতরাজা মৃগয়া করতে গিয়ে বিশ্রামরত অবস্থায় নিজেকে সেই গাছতলায় আবিষ্কার করে ভায়ের শোকে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। পরে বিভিন্ন অনুষঙ্গে তাদের পুনর্মিলন ঘটে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৪৫]*—

> শীতরাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। সকল রাজ্যের বন খুঁজিয়া, একটা হরিণ যে, তাহাও পাওয়া গেল না। শীত সৈন্য-সামন্তের হাতে ঘোড়া দিয়া এক গাছতলায় আসিয়া বসিলেন।

'কিরণমালা' গল্পটিতে মিথ-এর প্রভাব আরও স্পষ্ট। গল্পের রাজা একজন প্রজাহিতৈষী এবং তার মন্ত্রীও সমমনা। একদিন মন্ত্রী তাঁকে বলেন যে, পূর্বের রাজারা মৃগয়া করতেন এবং দিনের শেষে মৃগয়া সম্পন্ন হলে রাজ্য ঘুরে ঘুরে প্রজাদের সুখ-দুঃখ দেখতেন। এমন কথা শুনে রাজাও প্রজার মঙ্গলার্থে মৃগয়ায় যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং বহুবিধ প্রস্তুতির পর মৃগয়ায় যান *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৫০]*—

> রাজা মৃগয়া করিতে যাইবেন, রাজ্যে হুলুস্থূল পড়িল। হাতী সাজিল, ঘোড়া সাজিল, সিপাই সাজিল, সান্ত্রী সাজিল; পঞ্চকটক নিয়া, রাজা মৃগয়ায় গেলে।

মৃগয়া প্রসঙ্গটি 'পুষ্পমালা' গল্পেও উল্লেখ করা হয়েছে। গল্পের রাজা ও তার কোটাল উভয়ই নিঃসন্তান। সন্তান কামনায় তারা সবসময় উদাস। তারা নিজেদের কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন না। একদিন তারা মৃগয়ায় যান, কিন্তু সন্তান আকাঙ্ক্ষা তাদের পিছু ছাড়ে না। পশু শিকারের উদ্দেশ্যে মৃগয়া চলাকালীন সময়েও তারা স্বপ্নে দেখেন যে, তাদের সন্তান হয়েছে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৩৫০-৩৫১]*—

> রাজা ছিলেন মৃগয়ায়। সঙ্গে আঁটকুড়ে' কোটাল। সারাদিনেও শিকার পাইলেন না, রাজা বলিলেন, -- "কোটাল! শিকার-টিকার তো কিছু পাইলাম না, আইস, এইখানে একটু বসি।"
>
> রাজা বলিলেন, -- "কোটাল! তুমি আমি দু'জনেই পুত্রের কাঙ্গাল। কা'ল রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমাদের দু'জনের ঘরে দু'টি ছেলে হইয়াছে।"

'ডালিম কুমার' গল্পটিতে অনুরূপ 'মৃগয়ার' উল্লেখ পাওয়া যায়। গল্পটিতে মৃগয়া প্রসঙ্গ বিশদভাবে বর্ণনা করা না হলেও রামায়ণের কাহিনীতে রাম যেমন স্বর্ণরূপী-মৃগবেশধারী মারীচকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন তার

Dhaka University Institutional Repository

সাথে এর মিল আছে। রাজা মৃগয়ায় গেলে এক রাক্ষসী রানির আয়ুর রক্ষক পাশা করায়ত্ত করে রানিকে হত্যা করে তাঁর রূপ ধারণ করে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৭৯]*—

> এক রাজা, রাজার এক রানি, এক রাজপুত্র। রানির আয়ু একজোড়া পাশার মধ্যে,- রাজপুরীর তালগাছে এক রাক্ষসী এই কথা জানিত। কিন্তু কিছুতেই রাক্ষসী যো পাইয়া উঠে নাই। একদিন রাজা মৃগয়ায় গিয়াছেন, রাজপুত্র সখা সাথী পাঁচজন লইয়া পাশা খেলিতেছেন;

'কমল-সায়র' গল্পটিতে মৃগয়া প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলেও এখানে মৃগয়ায় যান রাজার পরিবর্তে রাজপুত্র। রাজপুত্রের সঙ্গী ময়ূর এক ঘুমন্ত রাজকন্যা এবং তার দুঃখ বর্ণনা করলে রাজপুত্র সাত দিনের মৃগয়া বাদ দিয়ে একদিন পরেই তাঁর রথ রাজপুরীর দিকে ফিরান *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ১৬০]*—

> একদিন, রাজপুত্র চলেছেন মৃগয়ায়।
>
> ময়ূর বললে, 'রাজপুত্র! শুক কি বলে, আমি জানি।'
>
> রাজপুত্র চেয়ে রইলেন।
>
> ময়ূরের মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে, জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কি জান ময়ূর?'
>
> ময়ূর বললে, 'রাজপুত্র, এক দেশে এক রাজকন্যা, ঘুমে। সে ঘুম ভাঙে না ভাঙবেও না। যদি কেউ ভাঙাবে, তো, সে থাকবে হীরে হয়ে।
>
> কিন্তু, রাজকন্যা যে-ঘুমে, সে-ঘুমে।'
>
> 'কোন দেশে?'
>
> ময়ূর বললে, 'তা জানি না।'
>
> রাজপুত্র সাতদিন মৃগয়া করেন। কিন্তু, একদিন মৃগয়া করেই, রাজপুত্র, রথ ফিরালেন।
>
> রাজপুত্র মৃগয়া করে এলে, রাজপুরীতে দামামা বাজে।
>
> দামামা বাজল না।

প্রভাব : পুরাণের কাহিনীগুলো রূপকথাতে প্রভাব ফেলেছে। পুরাণে যেমন রাজারা সৈন্যসহ মৃগয়ায় যেতেন রূপকথায়ও তেমন দেখা যায়। পুরাণে মৃগয়া কাহিনীর নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে বিশেষ কৌশল হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এই প্রভাব 'কিরণমালা', 'ডালিম কুমার', 'কমল-সায়র' প্রভৃতি গল্পে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পার্থক্য : পুরাণে মৃগয়ায় গেলে রাজারা অসূরদের দ্বারা আক্রান্ত হলেও রূপকথার গল্পগুলোতে রাজাদের আক্রান্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত তেমন নেই। তবে 'শীত-বসন্ত' গল্পে রাজার আত্মীয় আক্রান্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৩২. মঙ্গাল ব্রতে এবং পাপবিনাশিনী হিসেবে গঙ্গাজলের ব্যবহার

বাংলা রূপকথায় পাপবিনাশিনী হিসেবে গঙ্গাজলের যে ব্যবহার দেখানো হয়েছে, সেই একই কারণে পুরাণেও গঙ্গাজলের ব্যবহার করা হয়েছে। রূপকথায় গঙ্গাজলের ব্যবহার সম্পর্কিত যাবতীয় গল্প পুরাণ থেকেই এসেছে বলে ধারণা করা যায়। পুরাণ মতে বলা হয়, যুদ্ধে মৃত্যু এবং গঙ্গাজলে স্নান করলে স্বর্গ নিশ্চিত।

রামায়ণের বালকাণ্ডে গঙ্গার উৎপত্তি এবং পাপবিনাশিনী রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্বে গঙ্গা দেবতাগণের অধিকারে ছিল। অসুরেরা গঙ্গাকে নিজেদের অধিকারে নেয়ার জন্যে নানা চেষ্টা করে। বলা হয়, হিমালয়ের দুই কন্যা গঙ্গা ও উমা। মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে স্বচ্ছসলিলা পাপবিনাশিনী গঙ্গার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, গঙ্গা প্রথমে আকাশ এবং পরে দেবলোকে গমন করে। পরে অবশ্য পাপবিনাশের জন্যেই তার মর্ত্যে আগমন ঘটে *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ৬৪]*—

> এক সময়ে সুরগণ স্বকার্য সাধনের নিমিত্ত গঙ্গাকে হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হিমালয়ও ত্রিলোকের উপকারার্থ ত্রিপথ-বিহারিণী লোক-পাবনী গঙ্গাকে ধর্মানুসারে সুরগণের নিকট সমর্পণ করেন। আর যিনি হিমালয়ের দ্বিতীয়া কন্যা উমা তিনি তাপসী হইয়া কঠোর ব্রত অবলম্বনপূর্বক তপঃসাধন করিয়াছিলেন। হিমালয় এই সর্বজন-বন্দনীয়া নন্দিনীকে 'অপ্রতিমরূপ বিরূপাক্ষের হস্তে সম্প্রদান করেন। রাম। যে রূপে জলবাহিনী পাপবিনাশিনী গঙ্গা প্রথমে আকাশ ও তৎপরে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন।

মহাভারতেও গঙ্গাজলকে পাপবিনাশিনী রূপে দেখানো হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে মাতলি অর্জুনকে অমরাবতীতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলে অর্জুন গঙ্গাজলে স্নান করে পবিত্র হয়ে সেই জলে মন্ত্রজপ করে রথে আরহণ করে অমরাবতীতে গমন করেন এবং সেখানে তাঁর অপ্সরা উর্বশীর সাথে অভিসার ঘটে *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ১৬১]* —

> মাতলি বললেন, ইন্দ্রপুত্র, রথে ওঠ, দেবরাজ ও অন্য দেবগণ তোমাকে দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। অর্জুন বললেন, সাধু, মাতালি, তুমি আগে রথে ওঠ, অশ্বসকল স্থির হ'ক, তার পর আমি উঠব। অর্জুন গঙ্গায় স্নান ক'রে পবিত্র হয়ে মন্ত্রজপ ও পিতৃতর্পণ করলেন, তার পর শৈলরাজ হিমালয়ের স্তব ক'রে রথে উঠলেন।

'মঙ্গাল ব্রতে এবং পাপবিনাশিনী হিসেবে গঙ্গাজলের ব্যবহার' পুরাণে আলোচিত এই বিষয়টি বাংলা রূপকথার কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'শঙ্খমালা' গল্পের একটি চরিত্র শক্তি। তার স্বামী ও পুত্র নিরুদ্দেশ। তার কান্নার লবণাক্ত জলে সমুদ্রের ক্ষীরে-সরে ভরা জল লবণাক্ত হয়ে গেল। তা দেখে সমুদ্ররানি শক্তির কাছে এসে তাকে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে পবিত্র করে, পবিত্র পোশাক পরিয়ে বাতাসের মধ্যে বিভিন্ন দিকে ঘুরে দাঁড়াতে বললেন। তাতে শক্তি শরীরের নানা প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে। সমুদ্ররানি শক্তিকে তার স্বামী-পুত্র পাবার উপায় বলে দিলেন *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৪৫৬-৪৫৭]* —-

> ভাবিত হইয়া সাগর-রানি শক্তির নামে নূতন জলে ডুব দিলেন, শক্তির নামে শাঁখ-মঙ্গাল ব্রত করিলেন, সপ্ত ঘটে গঙ্গার জল নিঁয়া, শক্তির ঘরে গিয়া ডাক দিলেন–
>
> "গা তোল গা তোল শক্তি, ঘটে গঙ্গাজল;
> কতই নিদ্রা যাবি রে মা, উঠে' আঁখি মেল।
> গঙ্গার জলে সিনান কর রে শক্তি, দুঃখের গেল দিন,
> শক্তি সতী, উঠে' ব'স মা, সমুদ্রের পুলিন।
>
> – মা, তোর পুত্র পা'বি, তোর সোয়ামী পা'বি।"
>
> "– কি? – কি? –" সেই ডাক শক্তির কানে গেল, শক্তি নিশ্বাস ছাড়িয়া ধুক্, ধুক্, বুক উঠিয়া বসিয়া, বলিলেন, – "কোথায় মা, কোথায়! –"
>
> সাগর-রানি বলিলেন, – "মা, আগে নাও, ধোও, খাও, তা'র পরে বলিব।"
>
> সাগর-রানি ঘটে ঘটে গঙ্গাজলে নাওয়াইয়া, রত্ন পাটের শাড়ী, হার চন্দন পরাইয়া, খাওয়াইয়া, দাওয়াইয়া, শক্তিকে নিয়া সমুদ্রের পুলিনে গেলেন।

প্রভাব : গঙ্গাজলের ব্যবহার আর্য সংস্কৃতির একটি আচার। রূপকথায় গঙ্গাজলের যে ব্যবহার দেখানো হয়েছে তা পুরাণ প্রভাবিত। পুরাণে গঙ্গাজলকে পাপবিনাশিনী হিসেবে দেখানো হয়েছে; একইভাবে পাপবিনাশিনী হিসেবে রূপকথাতেও গঙ্গাজলের ব্যবহার পাওয়া যায়।

পার্থক্য : মিথ ও রূপকথাতে গঙ্গাজলের ব্যবহার নিয়ে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। শুধু ঘটনা ও চরিত্রের ক্ষেত্রে তার পার্থক্য রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. রক্ষ, যক্ষ, দানব ইত্যাদি সুরাসুরের উল্লেখ

বাংলা রূপকথায় যে রক্ষ, যক্ষ, দানব ইত্যাদি প্রসঙ্গ আছে, একই ধরনের প্রসঙ্গ মিথ-এর আখ্যান ও উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে। পুরাণে দেখা যায়, কোনো পরাক্রমশালী রাজা, দেবতা, অসুরের শক্তির তুলনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত চরিত্রগুলো অতি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

রামায়ণের বালকাণ্ডে ঋষিরা অসুরদের নির্যাতনে যজ্ঞ করতে না পারায় ঋষিদের পক্ষে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের পিতা দশরথের রাজদরবারে আসেন। তাঁকে সাদরে গ্রহণ করা হয় এবং যথাবিহিত সম্বোধন করা হয়। তখন ঋষি বিশ্বামিত্র যে সব অসুরদের কারণে যজ্ঞ করা সম্ভব হচ্ছে না তাদেরকে হত্যা করার জন্যে দশরথ পুত্র রামচন্দ্রকে নিয়ে যেতে চান। রাবণ সেসব অসুরদের পৃষ্ঠপোষক এ কথা শুনে দশরথ ভীত হন। তিনি প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে বিশ্বামিত্রের সাথে পাঠাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, সেই বিরাট রাবণের সামনে রক্ষ, দক্ষ, যক্ষ, গন্ধর্ব ও পতঙ্গ অতি তুচ্ছ। এই বালক রাম তাঁর পরাক্রম সহ্য করতে পারবেন না। আপনি আমাকে এবং আমার সৈন্য দলকে নিয়ে চলুন এবং রামের প্রসঙ্গ বাদ দিন *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ৪৫]*—

> সেই রাক্ষসাধিনাথ রাবণের শক্তি অতি অদ্ভুত। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব পতগ ও পন্নগেরাও তাহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না। রাবণ রণক্ষেত্রে অতি বলবানদিগেরও বলক্ষয় করিয়া থাকে।

পৌরাণিক চরিত্র রক্ষ, যক্ষ, দানব ইত্যাদি সুরাসুরের উল্লেখ বাংলা লোককথায় লক্ষণীয়। বাংলা রূপকথায় বিভিন্ন কাহিনীকে এসব শুভ ও অশুভ শক্তিধর জাতির উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাহিনীকে উৎকর্ষ দান করে বেশি আকর্ষণীয় ও পাঠকপ্রিয় করে তুলেছে।

'ডালিম কুমার' গল্পে ডালিম কুমার এক রাজার দেশে যান। সে দেশের রাজকন্যার সাথে যে রাজার বিয়ে হয় পরের দিন শুধু তার হাড়গোড় পাওয়া যায়, কিন্তু রাজকন্যা সে বিষয়ে কিছু বলতে পারেন না। রাজকুমারের রাজ– অভিষেকের পর রাতে যখন সব কিছু চুপচাপ, তখন ঘুমন্ত রাজকন্যা চিৎকার করে অজ্ঞান হয় এবং তার নাকের ভেতর থেকে সরু-মিহি চুলের মতো সাপ বাহির হয়ে তা ক্রমান্বয়ে প্রকাণ্ড অজগর সাপে পরিণত হয়। রাজপুত্র অন্ধ, দেখতে পায় না। সে হাতের তলোয়ার উঁচিয়ে বলে তুমি যে হও না কেন, রক্ষ, যক্ষ, দানব এ তলোয়ার তোমাকে স্পর্শ করবে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৮৩-৮৪]*—

> হাতের তরোয়াল ঝন্ ঝন্ – রাজপুত্র হাঁকিলেন – "জানি না, – যে হও তুমি, রক্ষ যক্ষ দানব! – যদি রাজপুত্র হই, যদি নিষ্পাপ শরীর হয়, দৃষ্টির আড়ালে তরোয়াল ঘুরাইলাম, এই তরোয়াল তোমাকে ছুঁইবে!"

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব : রক্ষ, যক্ষ, দক্ষ, গন্ধর্ব ইত্যাদি সনাতন পৌরাণিক চরিত্র। রামায়ণে রাবণের শক্তির পরিচয় দিতে গুচ্ছ আকারে উক্ত চরিত্রগুলোর নামোল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি 'ডালিম কুমার' গল্পে রাজপুত্রের তলোয়ারের শক্তি বোঝাতে উল্লেখিত চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে।

পার্থক্য : উল্লেখিত চরিত্রগুলো একইভাবে প্রকাশ করায় মৌলিক কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। তবে মিথ-এ এসব প্রসঙ্গ তুলে একজনের শক্তির তুলনা অন্যজন করলেও রূপকথায় নিজের শক্তি প্রসঙ্গেই এ কথা বলা।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. পবনপুত্র হনুমানের উল্লেখ

বাংলা রূপকথার গল্পে যে পবনপুত্র হনুমানের উল্লেখ আছে সে হনুমান মিথ-এর কাহিনী থেকেই এসেছে। রামায়ণের অনেক আখ্যানে হনুমান প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। হনুমান রামায়ণের অন্যতম শক্তিমান চরিত্র। রামায়ণ ছাড়াও মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যান ও উপাখ্যানে হনুমান চরিত্র উল্লিখিত হয়েছে ।

রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে রাম দূত হিসেবে হনুমানকে লঙ্কায় পাঠান। হনুমান লঙ্কার অশোকবনে দেবী সীতার সঙ্গে কথোপকথনের পর অশোকবন ধ্বংস করতে থাকেন। হনুমানের সেই ধ্বংসযজ্ঞ দেখে রাক্ষসগণ তা রাজা রাবণকে অবহিত করেন। রাবণ কিঙ্করদের হনুমানকে ধরতে পাঠান। তখন হনুমান তাঁর বিশালরূপ ধারণ করে কিঙ্করসকলকে হত্যা করেন। এরপর হনুমান রামের জয়, লক্ষ্মণের জয় বলে নিজের পরিচয় দেন *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ৫৯২]*—

> এদিকে মহাবীর হনুমান কিঙ্কর নামক রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া ভাবিলেন, আমি প্রমদবন ভগ্ন করিলাম, এক্ষণে ঐ সুমেরুশৃঙ্গাবৎ উচ্চ চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিব। তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া একলম্ফে কুলদেবতা-প্রাসাদে উত্থিত হইলেন। তৎকালে বিভাকরের ন্যায় তাঁহার প্রভাজাল চতুর্দিকে প্রসারিত হইল। তিনি বলপ্রদর্শনপূর্বক ঐ চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিলেন এবং স্বপ্রভাবে দেহবৃদ্ধি করিয়া নির্ভয়ে বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন। ঐ শ্রুতি-বিদারক শব্দে লঙ্কাপুরী শ্রুতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, পক্ষিগণ গগনতল হইতে পতিত হইল এবং চৈত্যপালেরা বিমোহিত হইয়া গেল। ইত্যবসরে হনুমান উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রামের আশ্রিত সুগ্রীবের জয়। আমি রামের কিঙ্কর, নাম মহাবীর হনুমান।

মহাভারতের বনপর্বে ভীমসেনের সাথে হনুমানের দেখা হয়। হনুমান ভীমের গন্তব্যস্থলের দুয়ার বন্ধ করে বসে থাকেন। ভীম তাকে সরতে বললে হনুমান অসম্মতি জানান। ভীম নিজের বীরত্বের কথা জানালে হনুমান ভীমকে নিজের লেজ সরাতে বলেন। ভীম ব্যর্থ হয়ে হনুমানের পরিচয় জানতে চায়, হনুমান তখন নিজের পরিচয় দেন *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ২০৫]* —

> হনুমান তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, রাজ্যলাভের পর রাম আমাকে এই বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর কথা যত দিন জগতে প্রচলিত থাকবে তত দিন আমি জীবিত থাকব। সীতার বরে সর্বপ্রকার দিব্য ভোগ্যবস্তু আমি ইচ্ছা করলেই উপস্থিত হয়।

পবনপুত্র ও রামভক্ত হনুমান পুরাণে উল্লেখিত এ চরিত্রটি বাংলার রূপকথাতেও উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা রূপকথায় 'শঙ্খমালা' গল্পটিতে অন্যান্য দেব-দেবীর সাথে পবনপুত্র হনুমানের উল্লেখও রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'শঙ্খমালা' গল্পে এক সওদাগরের এক ছেলে এবং এক মেয়ে। ছেলের নাম শঙ্খমণি এবং মেয়ের নাম কুঁজী। ছেলে বিয়ে দিয়ে সওদাগর মারা গেলেন। বাবা মারা যাওয়ার পর শঙ্খমণি বাবার ব্যবসার পরিবর্তে এখানে-সেখানে গান-বাজনা নিয়ে মেতে থাকতে শুরু করল। শঙ্খমণির বউ শক্তি এবং বোন কুঁজী অনেক কষ্টে দিনযাপন করতে থাকে। শঙ্খমণির মা রাজার ছেলে মোহন লালের কাছ থেকে শঙ্খমণি কোথায় তা জানতে পারেন। মাকে দেখে শঙ্খমণি না চেনার ভান করে থাকে। তখন মা কিরা দিলে শঙ্খমণি মায়ের সঙ্গে বাড়িতে ফিরে আসে এবং মায়ের কথামতো বাণিজ্যে যাবার ব্যবস্থা করে। সে একে একে সবার কাছ থেকে বিদায় নেয়। অবশেষে বউকে একটি খড়্গ দিয়ে বলে, আমি বারো বছর পরে ফিরব ততদিন তুমি দিনের বেলায় বাড়ির বাইরে গেলেও রাতের বেলায় এই খড়্গ হাতে নিয়ে ঘরের কবাট দিবে। দেব-দেবতা যেই আসুক না কেন তুমি কবাট খুলবে না। এই বলে খড়্গ শক্তির হাতে দিতেই তীর চলা শুরু করল খুবই দ্রুত গতিতে যেন পবন পুত্র হনুমান পালে টান দিল *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৪৩৬]* —

শঙ্খ খড়্গ দিলেন; শক্তির হাতে খড়্গ পড়িতেই, 'দিক্-পবন' ডাকিয়া আসিল, –
পালে পালে দিল টান – পবনের বেটা হনুমান, –

প্রভাব : হনুমান একটি বন্য প্রাণী হলেও পবনপুত্র ও রামভক্ত হনুমান প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক চরিত্র। যেহেতু রূপকথাতে পবনপুত্র হনুমানের উল্লেখ করা হয়েছে তাই নিঃসন্দেহে তা পুরাণ প্রভাবিত।

পার্থক্য : একই হনুমানের কথা বলা হলেও মিথ-এ তার কার্যকলাপ ও বর্ণনা বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আর রূপকথাতে উল্লেখিত হয়েছে অল্পভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. দেবরাজ / স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের উল্লেখ

বাংলা রূপকথায় স্বর্গের কাহিনী বর্ণনায় যে ইন্দ্রদেবের উল্লেখ করা আছে তা পুরাণে উল্লেখিত ইন্দ্র চরিত্র। স্বর্গরাজ ইন্দ্রের উল্লেখ পুরাণের বিভিন্ন আখ্যান ও উপাখ্যানে অহরহ পাওয়া যায়।

রামায়ণের বালকাণ্ডে উল্লেখিত হয়েছে যে, পূর্বকালে দেবতা ও অসুরগণ মিলিত হয়ে সমুদ্র মন্থন করে। সমুদ্র মন্থনের ফলে অমৃত উত্থিত হয়। তখন অমৃতের ভাগ নিয়ে দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অনেক অসুরের বিনাশ ঘটে। নিজেদের ক্ষয় দেখে অসুরগণ রাক্ষসদের সঙ্গে যুক্ত হয়। এ অবসরে বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধারণ করে অমৃত হরণ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র অসুরদের বিনাশের ফলে রাজ্য অধিকার করে স্বর্গের দেবতা, ঋষি-চারণ ইত্যাদি লোকসহ পৃথিবী শাসন করতে থাকেন *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ৭৮]*—

> সুররাজ ইন্দ্র ইহাদিগকে সংহার ও রাজ্য অধিকার করিয়া প্রফুল্ল মনে ঋষি-চারণ-পরিপূর্ণ লোকসকল শাসন করিতে লাগিলেন।

'দেবরাজ বা স্বর্গরাজ ইন্দ্র'-এই বৈদিক ও পৌরাণিক চরিত্রটি বাংলা রূপকথার গল্পে স্থান লাভ করেছে। বাংলা রূপকথায় সব গল্পে দৈবিক বল বা দেবতাদের উল্লেখ আছে সেখানে ইন্দ্র চরিত্রটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে।

'কাঞ্চনমালা' গল্পে কাঞ্চনের সাত বোন স্বর্গের অপ্সরা। তারা ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করে। নৃত্যরত অবস্থায় তাদের পায়ের নূপুর ঝরে পড়লে তারা চমকে ওঠে। মর্ত্যে জন্মগ্রহণকারী তাদের ছোট বোনের বিপদের কথা চিন্তা করে তারা মর্ত্যে নেমে আসে। তখন কাঞ্চনমালা তার বোনদের ছেড়ে দেয়া পাট বস্ত্র ধরে রথে উঠে ইন্দ্রলোকে (স্বর্গ) গমন করে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৪২১]* —

> সেই সময়ে দেব-দেবতা হানা দিল, আকাশ আসিয়া আভে ঘিরিল। – স্বর্গের অপ্সরা কাঞ্চনের সাত বোন্ ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করে, সাত বোনের পায়ের নূপুর ঝরিয়া পড়িল! সাত বোন্ চমকিয়া উঠিল, – "হাঁ, লো, মর্ত্যে যে আমাদের এক বোন জন্ম নিয়েছে, কাঞ্চন, তা'র বুঝি কোন বিপদ। –" সাত বোনে অমনি রথ সাজাইয়া, আসিতেই, নীচে চাহিয়া দেখে, – এ কি!
>
> নদীর জল 'সোম্, দোম্' –
>
> তা'রি নীচে কাঞ্চন বোন্! –
>
> সাত বোনে রথ নিয়া নামিয়া আসিলেন।
>
> রথের স্পর্শে বাতাস সুগন্ধ ছাড়ে, মেঘের উপর আলো ছাড়ে, মধুর বাঁশীর শব্দ! – সওদাগর চাহিয়া দেখেন– স্বর্গের রথে সাত পরী সাত তারা সাত চন্দ্রের জ্যোৎস্না, সাত বোনে ধরিয়া এক পাটবস্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়িয়া দিয়াছে; বাম হাত দিয়া, – জলের-তলের কাঞ্চনমালা মেঘের চুল এলাইয়া সেই পাটবস্ত্র ধরিয়া স্বর্গের রথে উঠিয়া গেল!

প্রভাব : রূপকথায় পৌরাণিক চরিত্র ইন্দ্রের উপস্থিতি অবশ্যই পুরাণ প্রভাবিত। কিন্তু পুরাণ থেকে শুধু ইন্দ্র ও স্বর্গ এই দুটি প্রসঙ্গ গ্রহণ করে তা রূপকথার ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়েছে।

পার্থক্য : রূপকথার ইন্দ্র ও পুরাণের ইন্দ্র একই হলেও যে ধরনের স্বর্গ ও অপ্সরাদের কথা রূপকথায় বলা হয়েছে তা পুরাণাশ্রিত নয়। রূপকথায় কাঞ্চনের সাত বোন অপ্সরা। কিন্তু মিথে উর্বশী, মেনকা ইত্যাদি অপ্সরার কথা বলা হয়েছে।

রূপকথাগুলোতে ইন্দ্রদেবকে কাহিনীর উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে তাতে রূপকথার নিজস্ব কাহিনীর অবতারণা করার জন্যে এ ধরনের পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. দেবতা কর্তৃক মানুষকে বর প্রদান

বাংলা রূপকথার 'দেবতা কর্তৃক মানুষকে বর প্রদান' প্রসঙ্গটি মিথ প্রভাবিত। মিথ-এর আখ্যানে-উপাখ্যানে বর প্রদান প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে প্রচলিত। মিথ-এ দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে পারলে বর এবং দেবতা ও ঋষিদের অনিষ্ট করলেই অভিশাপ প্রদান প্রচলিত বিষয়। অনেক ক্ষেত্রে দেবতাদের বর প্রদান নতুন উপাখ্যান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

অযোধ্যারাজ সাগরের ষাট হাজার পুত্র ঋষির অভিশাপে মারা গেলে তারা প্রেত হয়ে থাকে। তাদের উদ্ধারের জন্যে পরবর্তী বংশধরেরা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। অবশেষে সূর্য বংশীয়দের যোগ্য উত্তরাধিকারী ভগীরথ প্রজাপতি ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা করে। ভগীরথের তপোবলের সঙ্গে তার পূর্বসূরীদের তপোবলও যুক্ত হয়। ফলে ভগীরথের তপস্যায় ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর প্রদান করতে চাইলে, তিনি ষাট হাজার সাগর- পুত্রের উদ্ধারের জন্যে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনার প্রার্থনা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুত্র কামনা করেন। ব্রহ্মার বরে তা সফল হয় *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ৭২]*—

> অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া দেবগণের সহিত আগমনপূর্বক কহিলেন, ভগীরথ! তুমি তপোবলে আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। রাজর্ষি ভগীরথ সর্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমি যে তপঃ-সাধন করিয়াছি, যদি কিছু তাহার ফল থাকে, তাহা হইলে এই বর দিন, যেন আমা হইতে পিতামহগণের সলিল লাভ হয়। ঐ সমস্ত মহাত্মার ভস্মরাশি গঙ্গাজলে সিক্ত হইলে উঁহারা নিশ্চয়ই সুরলোকে গমন করিতে পারিবেন। হে দেব! এই আমার প্রথম প্রার্থনা। দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, আপনার বরে আমার যেন সন্তান-কামনা পূর্ণ হয়। আমি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; আমার এই বংশ যেন অবসন্ন না হয়।
>
> ব্রহ্মা রাজা ভগীরথের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, মহারথ! তোমার এই মনোরথ অতি মহৎ; আমার বরপ্রভাবে ইহা অবশ্যই সফল হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে বসুমতী এই হৈমবতী গঙ্গার পতন-বেগ সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব ইহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত হরকে নিয়োগ কর। হর ব্যতিরেকে গঙ্গাধারণ করিতে আর কাহাকেই দেখি না। লোক স্রষ্টা ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে এইরূপ কহিয়া গঙ্গাকে সম্ভাষণপূর্বক দেবগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন।

'দেবতা কর্তৃক মানুষকে বর প্রদান'-এ পৌরাণিক বিষয়টি বাংলা রূপকথার কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। মিথ-এ যেমন মানুষেরা দেবতাদের সন্তুষ্ট করে তাদের কাছে বর প্রার্থনা করে এবং দেবতাদের বরে ঐশ্বর্য, বীর্য ও শক্তি লাভ করে তেমনি রূপকথাতেও মানুষের দেবতা কর্তৃক বর প্রাপ্ত হয়ে অপার ক্ষমতা ও বিত্তের অধিকারী হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'কাঞ্চনমালা' গল্পে রূপ ও কাঞ্চন সায়র পাড়ে সোনার তাল গাছ না দেখে, পরদিন পূর্ণিমার রাতে স্বর্গ যাওয়ার সময় রূপসাগরের ওপর দিয়ে আসতেই তারা দেখে রূপসাগরে সোনার নালে অজস্র পদ্মের মধ্যে এক অপরূপা সুন্দরী কন্যার মুখ। রূপ-কাঞ্চন সেই সুন্দরী কন্যাকে দেখে সরোবরে নেমে পড়ে, কিন্তু কাঞ্চনের হাতের পাখার উল্টা বাতাসে পদ্ম এক নাগিনী এবং নাল এক ব্যাং হয়ে সায়র জলে ডুবে যায়। হায় হায় করতে করতে তারা স্বর্গরাজ ইন্দ্রের কাছে যায়। সব শুনে ইন্দ্র বলেন, আর কোনো উপায় নেই। তোমাদের এক বির দিই; তোমরা চিরকাল দেবতার মতো যুবা থাকবে, প্রতি বারো বছরের প্রথম পূর্ণিমার রাতে তোমরা সখীদের সাথে দেখাশোনা করতে পারবে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৪২৬]* —

> –"হায়! হায়!" করিয়া রূপ কাঞ্চন রথ ছুটাইয়া স্বর্গে গিয়া, ইন্দ্রের সিংহাসনের তলে লুটাইয়া পড়িলেন।
>
> ইন্দ্র কহিলেন, – "হায়! আর জীয়াইবার উপায় নাই! যা'ক, এক বর তোমাদিগকে দেই। এ পাখা আর তোমাদের কাছে রাখিও না, পাখা দাও; তোমরা দু'জনে চিরকাল দেবতার মত যুবা থাকিবে, – প্রতি বারো বৎসরের প্রথম পূর্ণিমার রাত্রে এক দিনের জন্য সরোবরে ঐ পদ্ম আবার ফুটিবে; সেই দিন তোমার সখীর সঙ্গে সারারাত তোমাদের দেখাশুনা হইবে। – ইহা ছাড়া আর উপায় নাই।"

প্রভাব : রূপকথার গল্পটিতে ইন্দ্র পৌরাণিক চরিত্র এবং দেবতাদের বর প্রদান প্রসঙ্গটি পুরাণের আলোচিত বিষয়। স্বর্গের যে স্বল্প বর্ণনা রূপকথায় দেয়া হয়েছে তা পুরাণাশ্রিত। রূপকথার গল্পটিতে পুরাণের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষণীয়।

পার্থক্য : মূল বিষয় একই হলেও কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র নির্মাণে কালের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্নতা দেখা যায়। মিথ-এ কঠোর তপস্যায় এবং অন্যের হিতসাধনে বর প্রাপ্তি ঘটলেও রূপকথায় তা দেখা যায় নি। শুধু একটু হাহাকারেই ইন্দ্র বর প্রদান করেছেন। যে বর রূপকথায় চাওয়া হয়, তার পেছনে কাজ করে কামনার সোৎসাহ আতিশয্য।

পুরাণে দৈবিক শক্তি ও দেবতার প্রসঙ্গ যত বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে রূপকথাতে তা একটু সংক্ষিপ্ত আকারে স্থান পেয়েছে। পুরাণে বর দেয়ার মধ্যে কামনা পূরণের তুলনায় মহৎ উদ্দেশ্য পূরণের বিষয় জড়িত। কিন্তু রূপকথায় লৌকিক কামনা-বাসনার আধিক্যের কারণে এ ধরনের পার্থক্য দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. স্বয়ংবরসভা

'স্বয়ংবরসভা' পৌরাণিক বিষয়। পুরাণের আখ্যানে রাজকন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে 'স্বয়ংবর' বিষয়টি গুরুত্বের সাথে স্থান লাভ করেছে।

মহাভারতের আদিপর্বে ভীষ্ম শান্তনু ও সত্যবতীর কনিষ্ট পুত্র বিচিত্রবীর্যের বিবাহ স্থির করেন। কাশীরাজার তিন কন্যার স্বয়ংবরের খবর পেয়ে তিনি বিমাতা সত্যবতীর অনুমতি নিয়ে স্বয়ংবরে উপস্থিত হন। সভায় অন্য রাজারা ভীষ্মকে বৃদ্ধ বলে অপমান করলে, তিনি অন্য সব রাজাদের পরাজিত করে কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংবর অনুষ্ঠান থেকে হরণ করেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ কন্যা অম্বার অনুরোধে তিনি শাল্ব রাজার কাছে অম্বাকে পাঠিয়ে দেন। বাকি দুই কন্যার সাথে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ ঠিক করলেও বিচিত্রবীর্য যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ৪২-৪৩]*—

> বিচিত্রবীর্য যৌবনলাভ করলে ভীষ্ম তাঁর বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন। কাশীরাজের তিন পরমা সুন্দরী কন্যার একসঙ্গে স্বয়ংবর হবে শুনে ভীষ্ম বিমাতার অনুমতি নিয়ে রথারোহণে একাকী বারাণসীতে গেলেন। তিনি দেখলেন, নানা দেশ থেকে রাজারা স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হয়েছেন। যখন পরিচয় দেবার জন্য রাজাদের নামকীর্তন করা হল তখন কন্যারা ভীষ্মকে বৃদ্ধ ও একাকী দেখে তাঁর কাছ থেকে সরে গেলেন। সভায় যে সকল হীনমতি রাজা ছিলেন তাঁরা হেসে বললেন, এই পরম ধর্মাত্মা পলিতকেশ নির্লজ্জ বৃদ্ধ এখানে কেন এসেছে? যে প্রতিজ্ঞাপালন করে না তাকে লোকে কি বলবে? ভীষ্ম বৃথাই ব্রহ্মচারী খ্যাতি পেয়েছেন।
>
> উপহাস শুনে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে তিনটি কন্যাকে নিজের রথে তুলে নিলেন এবং জলদগম্ভীরস্বরে বললেন, রাজগণ, বহুপ্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু ধর্মবাদিগণ বলেন যে, স্বয়ংবরসভায় বিপক্ষদের পরাভূত করে কন্যা হরণ করাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। আমি এই কন্যাদের নিয়ে যাচ্ছি, তোমাদের শক্তি থাকে তো যুদ্ধ কর।

মহাভারতের আদিপর্বে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর একটি বিশেষ প্রচলিত কাহিনী। রামায়ণের কাহিনীর মতো এখানেও বিবাহে শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। দ্রৌপদী স্বয়ংবর করলেও তাঁর পূর্বের ইচ্ছানুযায়ী তিনি অর্জুনকে স্বামী হিসেবে বরণ করেন। মহাবীর কর্ণ দ্রৌপদীর শর্ত পূরণ করে ফেলছে দেখে, দ্রৌপদী কোনো সূতজাতীয়কে স্বামী হিসেবে বরণ না করার ঘোষণা দেন *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ৮০]* —

> রাজারা অলংকার ও গন্ধদ্রব্যে ভূষিত হয়ে সভাস্থলে নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হলেন। নগরবাসী ও গ্রামবাসীরা দ্রৌপদীকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে মঞ্চের উপরে বসল, পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বসে পাঞ্চালরাজের ঐশ্বর্য দেখতে লাগলেন। অনেকদিন ধ'রে নৃত্য গীত ও ধনরত্নদান চলল। তার পর ষোড়শ দিনে দ্রৌপদী স্নান করে উত্তম বসন ও সর্বালংকারে ভূষিত হয়ে কাঞ্চনী মালা ধারণ ক'রে সভায় অবতীর্ণ হলেন। দ্রুপদের কুলপুরোহিত যথানিয়মে হোম ক'রে আহুতি

Dhaka University Institutional Repository

> দিলেন এবং স্বস্তিবাচন করিয়ে সমস্ত বাদ্য থামিয়ে দিলেন। সভা নিঃশব্দ হলে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সভার মধ্যদেশে নিয়ে এলেন এই ধনু, এই বাণ, ওই লক্ষ্য এবং মেঘ গম্ভীর উচ্চস্বরে বললেন, সমবেত ভূপতিগণ, আমার কথা শুনুন। ওই যন্ত্রের ছিদ্র দিয়ে পাঁচটি বাণ চালিয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে হবে। উচ্চকুলজাত রূপবান ও বলবান যে ব্যক্তি এই দুরূহ কর্ম করতে পারবেন, আমার ভগিনী কৃষ্ণা তাঁর ভার্যা হবেন — এ কথা আমি সত্য বলছি।

'স্বয়ংবরসভা' পুরাণে উল্লেখিত প্রসঙ্গটি বাংলা রূপকথার কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। 'শীত-বসন্ত' গল্পে এক রাজকন্যার স্বয়ংবর । নানা দেশ থেকে রাজপুত্ররা এসেছে। রাজকন্যা স্বয়ংবরের জন্যে বিভিন্ন অলংকারে সাজলে তার সঙ্গী সোনার টিয়া বলে, গজমোতি ছাড়া তোমার সাজ অসম্পূর্ণ। –এ কথা শুনে রাজকন্যা পণ করে, যে রাজপুত্র তাকে গজমোতি এনে দেবে সেই রাজপুত্রকেই সে বরণ করবে। সভায় উপস্থিত সকল রাজপুত্র চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও শীত রাজার ভাই বসন্ত গজমোতি নিয়ে আসে। তখন রাজকন্যা বসন্ত কুমারকে বরণ করে *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০: ৪০]* —

> সেই যে সোনার টিয়া—সেই যে রাজার মেয়ে? সেই রাজকন্যার যে স্বয়ম্বর। কত ধন, কত দৌলত, কত কি লইয়া কত দেশের কত রাজপুত্র আসিয়াছেন। সভা করিয়া সকলে বসিয়া আছেন, এখনো রাজকন্যার বা'র নাই।

প্রভাব : স্বয়ংবর একটি পৌরাণিক প্রথা; যা আর্য সংস্কৃতি থেকে এসেছে। বাংলা রূপকথায় স্বয়ংবরের উল্লেখ তাই নিঃসন্দেহে পুরাণ প্রভাবিত।

পার্থক্য : মূল বিষয়ে কোনো পার্থক্য নেই, বরং মিল রয়েছে অনেক। উভয় ক্ষেত্রেই রাজকন্যার শর্ত জুড়ে দেয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. স্বর্গের অপ্সরাদের উল্লেখ

বাংলা রূপকথায় যে অপ্সরাদের উল্লেখ আছে সেই একই বিষয় মিথ-এর বিভিন্ন আখ্যান ও উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে। পুরাণে দেখা যায়, দেবতা ও স্বর্গের বর্ণনা করার সময় নানা অনুষঙ্গে অস্পরাদের বর্ণনা করা হয়েছে।

রামায়ণের বালকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে যে, সুর ও অসুরগণ একত্রে অজর অমর হওয়ার জন্যে সমুদ্র মন্থন করলে অনেক জিনিস সমুদ্র থেকে উঠতে থাকে। তবে তাদের সবার উদ্দেশ্য থাকে অমৃত। কিন্তু মন্থন রজ্জু বাসুকি যে বিষ উদগার করে তাতে দেবতা ও অসুররা মারা যেতে থাকে। তখন দেবতাদের অনুরোধে শিব বিষ পান করেন এবং বিষ্ণু মন্থনদণ্ড ধারণ করলে দেবতারা তাদের মন্থন সম্পন্ন করে। ফলে নানাবিধ জিনিসের সাথে অপ্সরা উঠে আসে। পরে অমৃত নিয়ে গোলযোগ শুরু হলে বিষ্ণুর চতুরতার মাধ্যমে দেবতারা অমৃত লাভ করেন *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ৭৭-৭৮]*—

> সহস্র বৎসর অতীত হইল। আয়ুর্বেদময় ধন্বন্তরি দণ্ডকমণ্ডলু, হস্তে সমুদ্র-মধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তদনন্তর শোভনকান্তি অপ্সরাসকল উত্থিত হইল। মন্থন-নিবন্ধন (অপ্) ক্ষীররূপ নীরের সারভূত রস হইতে উত্থিত হইল বলিয়া তদবধি উহাদিগের নাম অপ্সরা রহিল। উদাদিগের সংখ্যা ষাট কোটি। এতদ্ভিন্ন উহাদের পরিচারিকা যে কত তাহা কিছুই স্থির হইল না। বৎস! অপ্সরাসকল সমুদ্র হইতে উত্থিত হইলে কি দেবতা কি দানব কেহই উহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না; সুতরাং তদবধি উহারা সাধারণ স্ত্রী বলিয়াই পরিগণিত হইল।

মহাভারতের বনপর্বে অর্জুন ইন্দ্রের আদেশে স্বর্গ আরোহণ করেন এবং অমরাবতীতে অনেক দিন বাস করেন। অর্জুন স্বর্গে আরোহণ করলে তাকে দেবতা, অপ্সরা সকলেই স্বাগত জানান। কিন্তু অর্জুন অপ্সরা উর্বশীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। তা দেখে ইন্দ্র উর্বশীকে অর্জুনের সাথে মিলনের আদেশ দিলে উর্বশী সে দায়িত্ব পালন করতে চান। কিন্তু অর্জুন অসম্মতি জানালে উর্বশী তাকে অভিশাপ দেন। পরে অবশ্য অর্জুন তার অভিশাপ থেকে মুক্ত হন।

অর্জুন অমরাবতীতে এলে দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ হৃষ্ট হয়ে তাঁর সংবর্ধনা করেন। তিনি নতমস্তকে প্রণাম করলে ইন্দ্র তাঁকে কোলে নিয়ে নিজের সিংহাসনে বসান। তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ গাইতে লাগলেন, ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, উর্বশী প্রভৃতি হাবভাবময়ী মনোহারিণী অপ্সরারা নাচতে লাগলেন। তারপর দেবগণ পাদ্যঅর্ঘ্য ও আচমনীয় দিয়ে অর্জুনকে ইন্দ্রের ভবনে নিয়ে গেলেন *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ১৬১-১৬২]*—

> ইন্দ্রের নিকট নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা ক'রে অর্জুন অমরাবতীতে পাঁচ বৎসর সুখে বাস করলেন। তিনি ইন্দ্রের আদেশে গন্ধর্ব চিত্রসেনের কাছে নৃত্য-গীত-বাদ্যও শিখলেন। একদিন চিত্রসেন উর্বশীর কাছে গিয়ে বললেন, কল্যাণী, দেবরাজের আদেশে তোমাকে জানাচ্ছি যে অর্জুন তোমার প্রতি আসক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছেন, তিনি আজ তোমার চরণে আশ্রয় নেবেন। উর্বশী নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান ক'রে স্মিতমুখে বললেন, আমিও তাঁর প্রতি অনুরক্ত। সখা, তুমি যাও, আমি অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হব।

অপারসুন্দরী, লাস্যময়ী, অনন্তযৌবনা স্বর্গের নর্তকী তথা 'অপ্সরা' পুরাণে উল্লেখিত এই চরিত্রটি বাংলা রূপকথার কাহিনীতে পাওয়া যায়। পুরাণের মতো রূপকথাতেও তাদেরকে নৃত্য-পটিয়সীরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলা রূপকথার যে গল্পে মর্ত্যের মানুষ ও রাক্ষসদের পাশাপাশি স্বর্গের দেবতাদের বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে স্বর্গের অপ্সরা প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে স্থান লাভ করেছে।

'কাঞ্চনমালা' গল্পে কাঞ্চনের স্বামী ও স্বামীর মাসী মালিনী কাঞ্চনের সাথে ষড়যন্ত্র করে। তারা কাঞ্চনের মুখে কাপড় জড়িয়ে এবং গলায় কলস ও লোহার শিকল বেঁধে নদীর জলে ফেলে দেয়। নদীর জল স্থির হলে কাঞ্চনের স্বামী নদীতে অসংখ্য স্বর্গের পদ্ম ও স্বর্গের পাতা দেখতে পায়। তার মধ্যে ভেসে থাকা কাঞ্চনের রূপ দেখে সে বিস্মিত হয়। ঐ সময় কাঞ্চনের সাত অপ্সরা বোন স্বর্গে নৃত্য করছিল। তাদের পায়ের নূপুর খুলে গেলে তারা কাঞ্চনের বিপদের কথা চিন্তা করে রথ নিয়ে এসে জল থেকে কাঞ্চনকে স্বর্গে নিয়ে যায় *[দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬: ৪২১৪]*—

সেই সময়ে দেব-দেবতা হানা দিল, আকাশ আসিয়া আভে ঘিরিল।—স্বর্গের অপ্সরা কাঞ্চনের সাত বোন্ ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করে, সাত বোনের পায়ের নূপুর ঝরিয়া পড়িল! সাত বোন্ চমকিয়া উঠিল,—"হাঁ, লো, মর্ত্যে যে আমাদের এক বোন জন্ম নিয়েছে, কাঞ্চন, তা'র বুঝি কোন বিপদ।—" সাত বোনে অমনি রথ সাজাইয়া, আসিতেই, নীচে চাহিয়া দেখে, —এ কি!

নদীর জল 'সোম্ দোম্'—

তা'রি নীচে কাঞ্চন বোন্!—

সাত বোনে রথ নিয়া নামিয়া আসিলেন।

রথের স্পর্শে বাতাস সুগন্ধ ছাড়ে, মেঘের উপর আলো ছাড়ে, মধুর বাঁশীর শব্দ!—

সওদাগর চাহিয়া দেখেন—স্বর্গের রথে সাত পরী সাত তারা সাত চন্দ্রের জ্যোৎস্না, সাত বোনে ধরিয়া এক পাটবস্ত্র ছাড়িয়া দিয়াছে; বাম হাত দিয়া,—জলের-তলের কাঞ্চনমালা মেঘের চুল এলাইয়া সেই পাটবস্ত্র ধরিয়া স্বর্গের রথে উঠিয়অ গেল!

প্রভাব : অপ্সরা সরাসরি পৌরাণিক চরিত্র। তাই রূপকথার অপ্সরা চরিত্রে অবশ্যই মিথ-এর প্রভাব আছে। রূপকথার গল্পে যে পটভূমিতে অপ্সরার বর্ণনা করা হয়েছে তাও অনেকাংশে পৌরাণিক।

পার্থক্য : রূপকথার অপ্সরা চরিত্র এবং মিথ-এর অপ্সরা চরিত্রের মধ্যে কোনো বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু কাহিনীর ভিন্নতার দরুন তাদের ভূমিকা হয়েছে ভিন্নতর।

Dhaka University Institutional Repository

এই ধরনের পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। কেননা পুরাণ প্রভাবিত হলেও গল্পের অবয়ব নির্মাণে লৌকিক ভাবের ও রূচির স্থান দেয়া হয়েছে। ফলে রূপকথায় পৌরাণিক অপ্সরা কিছুটা লোকজ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলা রূপকথার বিভিন্ন ঘটনাতে মিথ-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়।

প্রভাবগুলো হচ্ছে –

১. শুকপাখি;
২. পশুপাখির মানুষের মতো কথা বলা;
৩. পশুকর্তৃক পশুকে ঠকানো;
৪. মানুষের ইন্দ্রসভায় গমন;
৫. রক্তম্নানের প্রতিজ্ঞা ;
৬. বনবাস;
৭. পাতালপুরী;
৮. মানুষের রাক্ষস বধ;
৯. অন্যায় করার ফলে / অভিশাপে সাপ হয়ে যাওয়া;
১০. সোনার পদ্ম;
১১. সন্তানের আশায় শিকড় / ফল ভক্ষণ;
১২. ময়দানব প্রসঙ্গ;
১৩. ঐশ্বর্যমন্ডিত সভা নির্মাণ;
১৪. নববধূ বরণ;
১৫. পাশাখেলায় পণ-প্রথা;
১৬. মৃত মানুষের জীবন ফিরে পাওয়া;
১৭. নবজাতককে জলে ভাসিয়ে দেয়া;
১৮. নদীর জলে নবজাতক কুড়িয়ে পাওয়া;
১৯. রাক্ষস-রাক্ষসীর নর-মাংসের লোভ;
২০. পাশাখেলা;
২১. জলে ডুবে রূপবান / রূপবতী হওয়া;
২২. শর্ত সাপেক্ষে বিবাহ;
২৩. ঐশ্বর্যমন্ডিত ও সমরশক্তিসম্পন্ন রাজ্যের বর্ণনা;
২৪. সন্ন্যাসী কর্তৃক নবজাতকের নামকরণ;
২৫. দেবকারিগর বিশ্বকর্মার উল্লেখ;
২৬. গগনচুম্বী রাজপুরী;
২৭. রাক্ষস কর্তৃক রাজ্য উজাড়;

Dhaka University Institutional Repository

২৮. সন্তান লাভের আশায় যজ্ঞানুষ্ঠান;

২৯. ক্ষীর সাগর;

৩০. রাক্ষস-রাক্ষসীর মানব-রূপ ধারণ;

৩১. মৃগয়া;

৩২. মঙ্গল ব্রতে এবং পাপবিনাশিনী
হিসেবে গঙ্গাজলের ব্যবহার;

৩৩. রক্ষ, যক্ষ, দানব ইত্যাদি সুরাসুরের উল্লেখ;

৩৪. পবনপুত্র হনুমানের;

৩৫. দেবরাজ / স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের উল্লেখ;

৩৬. দেবতা কর্তৃক মানুষকে বর প্রদান;

৩৭. স্বয়ংবরসভা;

৩৮. স্বর্গের অপ্সরাদের উল্লেখ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা উপকথায় মিথ-এর প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা উপকথায় মিথ-এর প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম হলেও উপকথার যে কটি বিষয় মিথ প্রভাবিত তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। নিচে উপকথায় মিথ-এর প্রভাব দেখানো হলো–

১. পশু-পাখিদের মানুষের মতো কথা বলা

বাংলা উপকথা মূলত যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তা হলো 'পশু-পাখির মানুষের মতো আচরণ'। এ বিষয়টি মিথ-এ বিশেষ গুরুত্বের সাথে স্থান লাভ করেছে এবং মিথ-এর প্রভাবেই মূলত বাংলা উপকথায় এ প্রভাব এসেছে।

মহাভারতের আদিপর্বে পরীক্ষিত পুত্র জনমেজয়ের যজ্ঞে একটি কুকুর এলে জনমেজয়ের ভাইরা তাকে আঘাত করে। তখন কুকুর তার মায়ের কাছে গিয়ে তা বলে। কুক্কুরী জনমেজয়ের যজ্ঞে এসে তার পুত্রকে মারার কারণ জিজ্ঞেস করলে কেউ তার উত্তর দিতে পারে নি। তখন কুক্কুরী তাদেরকে মানুষের ভাষায় অভিশাপ দেয় *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ৩]* —

> জনমেজয়ের ভ্রাতারা তাকে প্রহার করলেন, সে কাঁদতে কাঁদতে তার মাতার কাছে গেল। কুক্কুরী ক্রুদ্ধ হয়ে যজ্ঞস্থলে এসে বললে, আমার পুত্রকে বিনা দোষে মারলে কেন? জনমেজয় প্রভৃতি কোনও উত্তর দিলেন না। কুক্কুরী বললে, এ কোনও অপরাধ করে নি তথাপি প্রহৃত হয়েছে; তোমার উপরেও অতর্কিত বিপদ এসে পড়বে।

রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডে দেবী সীতাকে রাবণ তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় জটায়ু তা দেখতে পান। তিনি রাবণকে এ অন্যায় কাজে নিষেধ করেন এবং বাধা দেন। সীতাকে উদ্ধার করতে গিয়ে রাবণের সাথে যুদ্ধ তিনি নিহত হন। জটায়ু রাবণের সাথে যে ভাষায় কথা বলেন তা মানুষের ভাষা *[হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪: ৩৮০]* —

> তৎকালে জটায়ু নিদ্রিত ছিলেন, এই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র রাবণকে দেখিতে পাইলেন এবং জানকীকেও দর্শন করিলেন। তখন ঐ গিরিশৃঙ্গাকার প্রখরতুন্ড বিহঙ্গ বৃক্ষ হইতে কহিতে লাগিলেন, রাবণ! আমি সত্যসঙ্কল্প, ধর্মনিষ্ঠ ও মহাবল। আমি পক্ষিগণের রাজা, নাম জটায়ু। ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমার সমক্ষে এইরূপ গর্হিতাচরণ করা তোমার উচিত হইতেছে না।

'পশু-পাখিদের মানুষের মতো কথা বলা' পুরাণে উল্লেখিত এ প্রসঙ্গটি বাংলা উপকথায় বর্ণিত হয়েছে। বলা যায়, বাংলা উপকথায় যেসব কাহিনী প্রচলিত আছে তা প্রায় সবই এই একটি বিষয়ের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। উপকথা রাজ্যে যারা মূল চরিত্র অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের পশু-পাখি তারা খুবই স্বাভাবিকভাবে মানুষের মতো কথা বলতে পারে। তা ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের মতো ভাষায় প্রকাশ করেছে। কথা

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েই তারা চালাকি, বিশ্বাসঘাতকতা, শত্রুতা, বন্ধুত্ব, মাতৃত্ব, ভয়, ভালোবাসা প্রভৃতি প্রকাশ করতে সক্ষম। যা একেবারেই পৌরাণিক চরিত্র হনুমান, গুরুড়, শুকপাখি, জটায়ু, বাসুকি প্রভৃতির সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। মিথ-এর প্রভাব উপকথার নিজস্ব কাঠামো তৈরিতে সহায়তা করেছে।

'টুনটুনি আর বিড়ালের কথা' গল্পে টুনটুনি একটি পাখি, যে এক গৃহস্থের বেগুন গাছে বাস করে। টুনটুনির তিনটি ছানা। গৃহস্থের বাড়িতে যে বিড়াল থাকে তার উদ্দেশ্য ছিল টুনটুনির বাচ্চা তিনটি খাওয়া। বিড়াল টুনটুনির সঙ্গে মানুষের ভাষায় কথা বলে *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ৩]*—

> গৃহস্থদের বিড়ালটা ভারি দুষ্টু। সে খালি ভাবে 'টুনটুনির ছানা খাব।' একদিন সে বেগুন গাছের তলায় এসে বলল, 'কী করছিস লা টুনটুনি?'

এ গল্পে টুনটুনি পাখির কণ্ঠেও মানুষের কথা নিঃসৃত হয়েছে। গল্পে টুনটুনির বাচ্চা খাবার উদ্দেশ্যে বিড়াল এলে টুনটুনি তাকে মহারাণী বলে সম্বোধন করে। ফলে বিড়াল সন্তুষ্ট হয়ে চলে যায়। কিন্তু যখন টুনটুনির ছানাগুলো উড়তে সক্ষম হয় তখন টুনটুনি বিড়ালকে 'লক্ষ্মীছাড়ি বিড়ালনি!' বলে উড়ে পালায়। বিড়াল তাকে ধরতে গিয়ে বেগুনের কাঁটার খোঁচা খেয়ে আহত হয় *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ৩]*—

> টুনটুনি তার মাথা হেঁট করে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বলল, 'প্রণাম হই, মহারানি!'

গল্পটিতে টুনটুনির ছানাদের মুখেও মানুষের ভাষায় কথা শোনা গিয়েছে। টুনটুনির তিনটি ছানা ছিল। তারা ছোট থাকার কারণে টুনটুনি বিড়ালকে তোষামোদ করত। ছানারা বড় হলে টুনটুনি তাদের জিজ্ঞেস করে যে তারা উড়তে পারবে কি না। উত্তরে টুনটুনির ছানার মানুষের ভাষায় কথা বলে *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ৩]*—

> তা দেখে টুনটুনি তাদের বলল, 'বাছা, তোরা উড়তে পারবি?'
> ছানারা বলল, 'হ্যাঁ মা, পারব।'

'টুনটুনি আর নাপিতের কথা' গল্পে টুনটুনি বেগুনের পাতায় নাচার সময় তার পায়ে একটি কাঁটা ফুটে যায়। এ কারণে তার পায়ে ফোড়া তৈরি হয়। সে ফোড়া কাটার জন্যে নাপিতের কাছে গেলে নাপিত তার ফোড়া কাটতে অসম্মতি জানায়। টুনটুনি রাজার কাছে বিচার চেয়ে বিচার পায় না। তখন সে ইঁদুরের কাছে গিয়ে রাজার ভুড়ি কাটার প্রস্তাব করে। কিন্তু রাজার কথা শুনে ইঁদুর তাতে অপারগতা জানায় *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ৪]*—

Dhaka University Institutional Repository

তাতে, টুনটুনির ভারি রাগ হল। সে ইঁদুরের কাছে গিয়ে বলল, 'ইঁদুরভাই, ইঁদুরভাই, বাড়ি আছ?'
ইঁদুর বলল, 'কে ভাই? টুনিভাই? এসো ভাই! বসো ভাই! খাট পেতে দিই, ভাত বেড়ে দিই, খাবে ভাই?'
টুনটুনি বলল, 'তবে ভাত খাই, যদি এক কাজ করো।'
ইঁদুর বলল, 'কী কাজ?'
টুনটুনি বলল, 'রাজামশাই যখন ঘুমিয়ে থাকবেন, তখন গিয়ে তাঁর ভুঁড়িটা কেটে ফুটো করে দিতে হবে।'
তা শুনে ইঁদুর জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে বলল, 'ওরে বাপরে! আমি তা পারব না।'

ইঁদুর অমত করলে, টুনটুনি বিড়ালের কাছে গিয়ে ইঁদুর মারার জন্যে বলে। বিড়াল টুনটুনি আপ্যায়নের কথা বললেও ইঁদুর মারতে রাজি হয় না। বিড়াল ঘুমের দোহাই দিয়ে বলে, আমি এখন ইঁদুর মারতে পারব না *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ৪-৫]*—

বিড়াল ভাই, টুনটুনি রাগ করে বিড়ালের কাছে গিয়ে বলল,'বিড়াল ভাই, 'বাড়ি আছ?'
বিড়াল বলল, 'কে ভাই? টুনিভাই? এসো ভাই! বসো ভাই! খাট পেতে দিই, ভাত বেড়ে দিই, খাবে ভাই?'
টুনটুনি বলল, 'তবে ভাত খাই, যদি ইঁদুর মারো।'
বিড়াল বলল, 'এখন আমি ইঁদুর-টিঁদুর মারতে যেতে পারব না, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে।'

এরপর টুনটুনি যথাক্রমে লাঠি, আগুন ও সাগরের কাছে গেলে তারাও বিভিন্ন অজুহাতে টুনটুনির কাজে সাহায্য করে নি। তখন রেগে গিয়ে টুনটুনি হাতির কাছে যায়। সে হাতিকে সাগরের সব জল খেয়ে ফেলার প্রস্তাব করে, কিন্তু উত্তরে হাতি বলে, যদি এত জল আমি খেয়ে ফেলি তবে আমার পেট ফেটে যাবে। সুতরাং এত জল আমি খেতে পারব না *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ৫]*—

তখন টুনটুনি হাতির কাছে গিয়ে বলল, 'হাতিভাই, হাতিভাই, বাড়ি আছ?' হাতি বলল, 'কে ভাই? টুনিভাই? এসো ভাই! বসো ভাই! খাট পেতে দিই, ভাত বেড়ে দিই, খাবে ভাই?'
টুনটুনি বলল, 'তবে ভাত খাই, যদি সাগরের জল সব খেয়ে ফেলো।'
হাতি বলল, 'অত জল খেতে পারব না, আমার পেট ফেটে যাবে।'

Dhaka University Institutional Repository

সব শেষে টুনটুনি মশার কছে গিয়ে তার সব বিষয় ব্যক্ত করে। টুনটুনি মশার কাছে হাতিকে কামড়ানোর প্রস্তাব দেয়। মশা তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে অন্য সব মশাদের নিয়ে হাতির গায়ে কামড় দিতে থাকে। তখন হাতি, সাগর, আগুন, লাঠি, বিড়াল, ইঁদুর, রাজা সবাই টুনটুনির কাজ করতে সম্মত হয়। তখন রাজার আদেশে নাপিত টুনটুনির ফোড়া কেটে ফেলে *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ৬]*—

> টুনটুনি শেষে মশার কাছে গেল। মশা দূর থেকে তাকে দেখেই বলল, 'কে ভাই? টুনি ভাই? এসো ভাই! বসো ভাই! খাট পেতে দিই, ভাত বেড়ে দিই, খাবে ভাই?'
>
> টুনটুনি বলল, 'তবে ভাত খাই, যদি হাতিকে কামড়াও।'
>
> মশা বলল, 'সে আবার একটা কথা! এখুনি যাচ্ছি। দেখব হাতি ব্যাটার কত শক্ত চামড়া!' বলে, সে সকল দেশের সকল মশাকে ডেকে বলল, 'তোরা আয় তো রে ভাই, দেখি হাতি ব্যাটার কত শক্ত চামড়া।'

'নরহরি দাস' গল্পে ছাগলের কথায় মায়ের মায়া মমতার ছাপ লক্ষণীয়। ছাগল একটি গর্তে বাস করে। তার একটি বাচ্চা আছে এবং বাচ্চাটি গর্তের বাইরে আসতে চায়। ছাগল যেখানে বাস করে সেখানে বাঘ, সিংহ, ভালুকের ভয়। তাই ছাগল তার ছানাটিকে গর্তের বাইরে আসতে নিষেধ করে *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ৯]*—

> বাইরে যেতে চাইলেই তার মা বলত, 'যাসনে! ভালুকে ধরবে, বাঘে নিয়ে যাবে, সিংহে খেয়ে ফেলবে!'

গল্পটিতে ষাঁড় ও ছাগলছানার কথোপকথন খুবই আকর্ষণীয়। তারা গ্রাম্য ভাষায় কথা বলেছে। ছাগলের বাচ্চাটি কখনও গর্তের বাইরে আসে নি। যেদিন সে গর্তের বাইরে এল, একটি ষাঁড় দেখতে পেল সে। ষাঁড়টি ছিল বিশালাকৃতির। ষাঁড়ের শিং দেখে ছাগলছানা ষাঁড়টিকেও ছাগল ভাবল। সে ষাঁড়টি কী খেয়ে এত মোটা হয়েছে –তা জানতে চায়। ষাঁড়টি তাকে বনের ভেতরের বড় বড় ঘাসের কথা জানাল। তখন ছাগলছানা ষাঁড়ের সাথে বনের ভিতরে যেতে চাইলে ষাঁড় তাতে সম্মতি জানায় *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ১০]*—

> সে ষাঁড়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁগা, তুমি কী খাও?'
>
> ষাঁড় বলল, 'আমি ঘাস খাই।'
>
> ছাগলছানা বলল, 'ঘাস তো আমার মাও খায়, সে তো তোমার মতো এত বড় হয়নি।'
>
> ষাঁড় বলল, 'আমি তোমার মায়ের চেয়ে ঢের ঢের ভালো ঘাস অনেক বেশি করে খাই।'
>
> ছাগলছানা বলল, 'সে ঘাস কোথায়?'
>
> ষাঁড় বলল, 'ওই বনের ভিতরে।'

Dhaka University Institutional Repository

ছাগলছানা বলল, 'আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে।' একথা শুনে ষাঁড় তাকে নিয়ে গেল।

বনের ভেতরে ছাগলছানাটি যতক্ষণ পারল ঘাস খেল। বেশি ঘাস খাওয়ার ফলে তার পেট এত মোটা হলো যে, সে আর হাঁটতে পারল না। ষাঁড় তাকে ফিরতে বললে সে বলল তুমি যাও, আমি হাঁটতে পারছি না। আমি কাল যাব। সন্ধ্যা হলে সে একটি শিয়ালের গর্তে প্রবেশ করল। কিন্তু তখন শিয়াল সেখানে ছিল না। অনেক রাত্রে শিয়াল এল। শিয়াল অন্ধকারের জন্যে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিল না। শিয়াল তার নিজের গর্তে অন্য প্রাণী দেখে দূর থেকে গর্তের ভিতরে কে তা জানতে চাইল। ছাগলছানা তখন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে নিজেকে ভয়ংকর প্রাণী হিসেবে বর্ণনা দিল। তখন বাবা গো বলে শিয়াল দৌড়ে বাঘের কাছে চলে গেল *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ১০]*—

> শিয়াল অন্ধকারের ভিতর ভালো করে দেখতে পেল না। সে ভাবল বুঝি রাক্ষস-টাক্ষস হবে। এই মনে করে সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'গর্তের ভিতর কে ও?'
>
> ছাগলছানাটা ভারি বুদ্ধিমান ছিল, সে বলল –
>
> লম্বা লম্বা দাঁড়ি
> ঘন ঘন নাড়ি।
> সিংহের মামা আমি নরহরি দাস
> পঞ্চাশ বাঘে মোর এক এক গ্রাস!
>
> শুনেই তো শিয়াল 'বাবা গো!' বলে সেখান থেকে দে ছুট! এমন ছুট দিল যে একেবারে বাঘের ওখানে গিয়ে তবে সে নিশ্বাস ফেলল।

বাঘ শিয়ালকে ভাগনে সম্বোধন করে বলল, ভাগনে ফিরলে যে? *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ১০]*—

> বাঘ তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাগনে, এই গেলে, আবার এখনই এত ব্যস্ত হয়ে ফিরলে যে?'

'বোকা জোলা আর শিয়ালের কথা' গল্পে শিয়াল ও জোলা দুই বন্ধু। শিয়াল তার বুদ্ধি দিয়ে রাজকন্যার সঙ্গে বন্ধু জোলার বিয়ে ঠিক করে । বিয়েতে আনন্দ করার জন্যে, গান-বাজনা করার জন্যে সে ব্যাঙদের আমন্ত্রণ জানায় *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ১৫]*—

> তারপর শিয়াল ব্যাঙদের কাছে গিয়ে বলল, 'ভাই সকল, আমার বন্ধুর বিয়ে, তোমাদের নিমন্ত্রণ। তোমরা গান গাইতে যাবে।'
>
> সকল ব্যাঙ ঘোঁতঘোঁত করে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব।'

Dhaka University Institutional Repository

শিয়াল ব্যাঙদের আমন্ত্রণের পর শালিকদেরও একই আমন্ত্রণ জানায়। তাতে শালিকেরাও তার আমন্ত্রণে সাড়া দেয় *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ১৫]* —

> তারপর শিয়াল শালিকদের কাছে গিয়ে বলল, 'ভাই সকল, আমার বন্ধুর বিয়ে, তোমাদের নিমন্ত্রণ। তোমরা গান গাইতে যাবে।
> শালিকের দল কিচিরমিচির করে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব।'

তারপর, শিয়াল যথাক্রমে হাঁড়িচাঁচা, ঘুঘু, কুক্কো, উৎক্রোশ, বৌ-কথা-কও, ময়ূর, চোখ–গেল, ভগদত্ত প্রভৃতি পাখিদের আমন্ত্রণ জানায়। সকল পাখিই তার আমন্ত্রণে সাড়া জানায় এবং নাচ-গান করতে সম্মতি দেয় *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ১৫]* —

> তারপর শিয়াল হাঁড়িচাঁচাদের কাছে, ঘুঘুদের কাছে, কুক্কো পাখিদের কাছে, উৎক্রোশ পাখিদের কাছে, বৌ-কথা-কদের কাছে, ময়ূরদের কাছে, চোখ-গেলদের আর ভগদত্তদের কাছে গিয়েও তেমনি করে নিমন্ত্রণ করে এল। তারা সবাই বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব।'

'কুঁজো-বুড়ির কথা' গল্পে কুঁজো-বুড়ি তার নাতনির বাড়ি যাবার পথে শিয়াল ও বাঘের কাছ থেকে রক্ষা পেয়ে এলেও শেষে এক ভালুকের খপ্পরে পড়ে। ভালুক তাকে মানুষের মতো করে বলে, 'ওই রে, সেই কুঁজো-বুড়ি যাচ্ছে। বুড়ি তোকে তো খাব।' *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ১৫]* —

> এক ভালুক তাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'ওই রে, সেই কুঁজো-বুড়ি যাচ্ছে। বুড়ি, তোকে তো খাব!'
> বুড়ি বলল, 'রোস, আমি আগে নাতনির বাড়ি থেকে মোটা হয়ে আসি, তারপর খাস। এখন খেলে তো শুধু হাড় আর চামড়া খাবি, আমার গায়ে কি আর কিছু আছে?
> শুনে ভালুক বলল, 'আচ্ছা, তবে মোটা হয়ে আয়, তারপর খাব এখন।'

'উকুনে-বুড়ির কথা' গল্পে উকুনে-বুড়ি স্বামীর নির্যাতনের কারণে সংসার ছেড়ে চলে আসে। তখন বক তাকে নিজের রাঁধুনি হিসেবে বাড়িতে নিয়ে যায়। কিন্তু একদিন শোল মাছ রান্না করার সময় বুড়ি মারা গেলে, সেই শোকে বক সাত দিন কিছু খায় নি। সে সময় নদী বককে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলে বক বলে যদি আমি আমার দুঃখের কথা বলি তবে, তোমার জল ফেনা হয়ে যাবে।' *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ২১]* —

Dhaka University Institutional Repository

বক বলল, 'আরে ভাই, সে কথা বলে কী হবে? আমার যা হবার তা হয়েছে।'

নদী বলল, 'ভাই, আমাকে বলতে হবে।'

বক বলল, 'যদি বলি, তবে কিন্তু তোর সব জল ফেনা হয়ে যাবে।'

'পান্তা বুড়ির কথা' গল্পে পান্তা বুড়ি খুবই পান্তা ভালোবাসে। কিন্তু একটি চোর তার পান্তা চুরি করে নিয়ে যায়। একদিন বুড়ি রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছিল। বুড়ি একটি পুকুরের ধার দিয়ে যাবার সময় একটি শিঙি মাছ পান্তা বুড়ির দুঃখের কারণ জানতে চাইলে, পান্তা বুড়ি সব কিছু খুলে বলে। তখন শিঙি মাছ পান্তা বুড়িকে ফিরে যাবার সময় তাকে নিয়ে যেতে বলে। সে আরও বলে তাতে নাকি পান্তা বুড়ির উপকার হবে। শেষে অবশ্য শিঙি মাছের কথা সত্য হয়েছিল *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ২৪]* —

পান্তাবুড়ি পুকুর ধার দিয়ে যাচ্ছিল। একটা শিঙিমাছ তাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?'

পান্তাবুড়ি বলল, 'চোরে আমার পান্তা ভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি!'

শিঙিমাছ বলল, 'ফিরে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেয়ো, তোমার ভালো হবে।'

'চড়াই আর কাকের কথা' গল্পে গৃহস্থের বাড়িতে চাটাই ফেলে ধান ও লঙ্কা শুকাতে দেয়া হয়েছিল । চড়াই তার বন্ধু কাককে বলল, 'তুমি লঙ্কা খেয়ে শেষ করতে পারবে, না আমি ধান খেয়ে শেষ করতে পারব।' তখন কাক ও চড়াই প্রত্যেকে আগের শেষ করার কথা জানায়। তারপর তারা শর্ত সাপেক্ষে যে যার খাওয়া শুরু করে *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ২৬-২৭]* —

চড়াই তা দেখে কাককে বলল, 'বন্ধু, তুমি আগে লঙ্কা খেয়ে শেষ করতে পারবে, না আমি আগে ধান খেয়ে শেষ করতে পারব?'

কাঁক বলল, 'আমি লঙ্কা আগে খাব।'

চড়াই বলল, 'না, আমি ধান আগে খাব।'

'বোকা কুমিরের কথা' গল্পে কুমির ও শিয়াল দু জন মিলে আলু চাষ করে। কুমির নিজে বোকা হয়েও শিয়ালকে ঠকাতে চাইল। সে শিয়ালের কাছে আলু গাছের আগার অংশ পেতে চাইল। শিয়াল ছিল চালাক। সে কুমিরের বোকামি বুঝতে পেরে সম্মতি জানাল। কুমির তার কথামতো কাজ করে বড় ঠকা ঠকল। পরবর্তীতে আরও অনেক কিছু চাষ করেও নিজের বোকামির জন্যে কুমির প্রত্যেক বার ঠকতে থাকে। তাই সে আর শিয়ালের সাথে কোনো কিছু চাষ না করতে সিদ্ধান্ত নেয় *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ৫১]* —

সে শিয়ালকে ঠকাবার জন্যে বলল, 'গাছের আগার দিক কিন্তু আমার, আর গোড়ার দিক তোমার।'

Dhaka University Institutional Repository

শুনে শিয়াল হেসে বলল, 'আচ্ছা তাই হবে।'

'বাঘখেকো শিয়ালের ছানা' গল্পে বোকা বাঘ শিয়ালের চালাকির শিকারে পরিণত হয়। শিয়াল ও শিয়ালনি চালাকি করে বাঘকে ভয় দেখাতে থাকে। এক পর্যায়ে শিয়াল বাঘকে দেখে, বলে আমার ঝপাংটা দাও, এখনই ওকে ভতাং করছি। এ কথা শুনে বাঘ ভয়ে পালাতে থাকে। তা দেখে একটি বানর আশ্চর্য হয়ে বলল 'তুমি কেন অমন করে ছুটে পালাচ্ছ?' *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ৫৮]*—

> একটা বানর গাছের উপর থেকে তাকে ছুটতে দেখে ভারি আশ্চর্য হয়ে ভাবল, 'তাই তো, বাঘ এমনি ছুটছে, এ তো সহজ কথা নয়! নিশ্চয় একটা ভয়ানক কিছু হয়েছে? এই ভেবে সে বাঘকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'বাঘ ভাই, বাঘ ভাই, কী হয়েছে!' তুমি যে অমন করে ছুটে পালাচ্ছ?

'পিঁপড়ে আর হাতি আর বামুনের চাকর' গল্পে এক পিঁপড়ে ও তার পিঁপড়ির মধ্যে খুব ভাব। একদিন পিঁপড়ি মারা যাবার পর পিঁপড়ে তাকে গঙ্গায় ফেলবে কি না জানতে চাইলে পিঁপড়ে বলে, অবশ্যই ফেলব। পিঁপড়ের একই প্রশ্নে পিঁপড়িও একই উত্তর দেয় *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ৬৫]*—

> একদিন পিঁপড়ি বলল, 'দেখো পিঁপড়ে, আমি যদি তোমার আগে মরি, তবে কিন্তু তুমি আমাকে গঙ্গায় নিয়ে ফেলবে। কেমন পিঁপড়ে, ফেলবে তো?'
>
> পিঁপড়ে বলল, 'হ্যাঁ পিঁপড়ি, অবিশ্যি ফেলব। আর আমি যদি তোমার আগে মরি, তবে কিন্তু তুমি আমাকে গঙ্গায় নিয়ে ফেলবে। কেমন পিঁপড়ি, ফেলবে তো?।
>
> পিঁপড়ি বলল, 'তা আর বলতে, অবশ্যি ফেলব।'

এছাড়াও 'টুনটুনি আর রাজার কথা' গল্পে টুনটুনির মুখে, 'কুঁজো-বুড়ির কথা' গল্পে শিয়াল ও বাঘের মুখে, 'উকুনে-বুড়ীর কথা' গল্পে ঘুঘুর মুখে, 'চড়াই আর কাকের কথা' গল্পে মোষ ও কুকুরের মুখে, 'দুষ্টু বাঘ' গল্পে শিয়াল ও বাঘের মুখে, 'বাঘ-বর' গল্পে বাঘ ও কাকের মুখে, 'বাঘের উপর টাগ' গল্পে বাঘের মুখে, 'বুদ্ধুর বাপ' গল্পে বাঘের মুখে, 'বোকা বাঘ' গল্পে বাঘ ও শিয়ালের মুখে, 'বাঘের রাঁধুনি' গল্পে বাঘের মুখে, 'সাক্ষী শিয়াল' গল্পে শিয়ালের মুখে, 'আখের ফল' গল্পে শিয়ালের মুখে, 'মজন্তালি সরকার' গল্পে বাঘ ও বিড়ালের মুখে মানুষের ভাষায় কথা শোনা যায়। এসব পশু-পাখির মুখে মানুষের ভাষা ও মানুষের মতো আচরণ উপকথার গল্পগুলোকে সৃষ্টিতে মূল ভূমিকা পালন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব : মিথ-এর এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই উপকথার বিশাল ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। পশু-পাখির মানুষের মতো কথা বলা বিষয়টি পুরাণের আলোচ্য বিষয় এবং পুরাণের এ বিষয়টি উপকথায় প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে।

পার্থক্য : পুরাণে প্রায় প্রত্যেকটি প্রাণীকে ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে অঙ্কন করা হলেও উপকথার অনেক প্রাণীই ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। মিথ-এ পশু-পাখির কথোপকথনের ভেতরে যুক্তি ও ধর্মীয় দর্শন থাকলেও উপকথায় প্রাণীদের কথা খুবই হালকা ভাবের এবং তাতে ধর্ম ও যুক্তির তেমন কোনো ঠাঁই নেই।

পুরাণে প্রাণীদের কথোপকথনে আধ্যাত্মিকতার বিষয় স্থান পেয়েছে। কিন্তু উপকথার গল্পগুলো লৌকিক ভাবের এবং তা নিছক মনোরঞ্জনের জন্যে তৈরি। তাই রূপকথা ও মিথ-এর এ ধরনের পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক।

Dhaka University Institutional Repository

২. পশু-পাখির বিশ্বাসঘাতকতা

'পশু-পাখির বিশ্বাসঘাতকতা' বাংলা উপকথায় বর্ণিত এ বিষয়টি পুরাণের। পুরাণে বিভিন্ন আখ্যানে বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রের মুখে যেসব উপাখ্যান উচ্চারিত হয়েছিল তাতে এ ধরনের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। মহাভারতের সভাপর্বে শিশুপাল ও ভীষ্মের মধ্যে যে বাগযুদ্ধ হয় তাতে শিশুপাল একটি উপাখ্যান শোনান। তাতে বলা হয়, এক বৃদ্ধ হাঁস সবসময় সত্যের উপদেশ দিত। তাকে সরল বিশ্বাস করে অন্য পাখিরা তাকে খাদ্য যোগাড় করে দিত এবং নিজেদের ডিমগুলো তার কাছে রেখে দিত। কিন্তু সেই হাঁস পাখিদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাখিদের ডিম খেয়ে ফেলত। কিছুদিন পর তার জানতে পেরে পাখিরা সেই বিশ্বাসঘাতক হাঁসকে হত্যা করে *[রাজশেখর বসু ১৯৮৭: ১১৯]*—

> এক বৃদ্ধ হংস সমুদ্রতীরে বাস করত, সে মুখে ধর্ম কথা বলত কিন্তু তার স্বভাব অন্যবিধ ছিল। সেই সত্যবাদী হংস সর্বদা বলত, ধর্মাচরণ কর, অধর্ম ক'রো না। জলচর পক্ষীরা সমুদ্র থেকে খাদ্য সংগ্রহ ক'রে তাকে দিত এবং তার কাছে নিজেদের ডিম রেখে চরতে যেত। সেই পাপী হংস সুবিধা পেলেই ডিমগুলি খেয়ে ফেলত।

'পশু-পাখির বিশ্বাসঘাতকতা' পুরাণে উল্লেখিত এই বিশেষ অতিলৌকিক বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বাংলা উপকথার বিশাল ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। উপকথার রাজ্যে এমন বিষয় প্রায়ই দেখা যায়। এ ধরনের বিষয় উপকথাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ ও মনোরঞ্জক করে তোলে। কেননা প্রায় ক্ষেত্রেই বিষয়টি কাহিনীতে নতুন দিক উন্মোচন করতে সাহায্য করে।

'বাঘ মামা আর শিয়াল ভাগনে' গল্পে শিয়াল একদিন বাঘকে নিজের বাসা দেখাতে আবদার করে। বাঘ শিয়ালের আবদার পূরণ করতে শিয়ালের বাসায় যায়। কিন্তু শিয়াল বিশ্বাসঘাতকতা করে বাঘকে কুয়োর মুখে বিছানো মাদুরে বসতে বলে। মাদুরে বসতে গিয়ে বাঘ কুয়োর ভেতরে পড়ে যায়। পরে অবশ্য অনেক চেষ্টার পর জীবন রক্ষা করে *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ১১]*—

> একদিন শিয়াল নদীর ধারে একটা মাদুর দেখেতে পেয়ে, সেটাকে টেনে তার বাড়িতে নিয়ে এল। এনে, সেই কুয়োর মুখের উপর তাকে বেশ করে বিছিয়ে বাঘকে গিয়ে বলর, 'মামা, আমার নতুন বাড়ি দেখতে গেলে না?' শুনে বাঘ তখনই তার নতুন বাড়ি দেখতে এল। শিয়াল তাকে সেই কুয়োর মুখে বিছানো মাদুরটা দেখিয়ে বলল, 'মামা, একটু বসো, জলখাবার খাবে।'
>
> জলখাবারের কথা শুনে বাঘ ভারি খুশি হয়ে, লাফিয়ে সেই মাদুরের উপর বসতে গেল, আর অমনি সে কুয়োর ভেতরে পড়ে গেল। তখন শিয়াল বলল, 'মামা, খুব করে জল খাও, একটুও রেখো না যেন!'

Dhaka University Institutional Repository

'দুষ্টু বাঘ' গল্পে রাজার বাড়িতে খাঁচার ভেতরে এক বাঘ বন্দি হয়ে থাকত। একদিন রাজার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে আসা এক ব্রাহ্মণকে দেখে বাঘ তাকে প্রণাম দিতে লাগল। এতে ব্রাহ্মণের মনে বাঘের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। তিনি বাঘকে জিজ্ঞাসা করলেন কী চাও বাপু? বাঘ তখন তাকে ছেড়ে দেয়ার প্রার্থনা করলে ব্রাহ্মণ বাঘটিকে ছেড়ে দেন। ছাড়া পেয়েই বাঘটি ব্রাহ্মণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্রাহ্মণকে খেতে চাইল। পরে অবশ্য শিয়াল পন্ডিতের সহযোগিতায় ব্রাহ্মণ মুক্তি পান *[উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৯৯৫: ৩১]*—

> এর মধ্যে রাজার বাড়িতে খুব নিমন্ত্রণের ধুম লেগেছে। বড় বড় পন্ডিত মশাইয়েরা দলে দলে নিমন্ত্রণ খেতে আসছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ঠাকুর দেখতে ভারি ভালোমানুষের মতো ছিলেন। বাঘ এই ঠাকুরমশাইকে বারবার প্রণাম করতে লাগল।
>
> তা দেখে ঠাকুরমশাই বললেন, 'আহা, বাঘটি তো বড় লক্ষ্মী! তুমি কী চাও বাপু?'
>
> বাঘ হাত জোড় করে বলল, 'আজ্ঞে, একটি বার যদি এই খাঁচার দরজাটা খুলে দেন! আপনার দুটি পায়ে পড়ি।'
>
> ঠাকুরমশাই কিনা বড্ড ভালোমানুষ ছিলেন, তাই তিনি বাঘের কথায় তাড়াতাড়ি খাঁচার দরজা খুলে দিলেন।
>
> তখন হতভাগা বাঘ হাসতে হাসতে বাইরে এসেই বলল, 'ঠাকুর, আপনাকে তো খাব!'
>
> আর কেউ হলে হয়তো ছুটে পালাত। কিন্তু এই ঠাকুরটি ছুটতে জানতেন না। তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'এমন কথা তো কখনও শুনিনি! আমি তোমার এত উপকার করলাম, আর তুমি বলছ কিনা আমাকে খাবে! এমন কাজ কি কেউ কখনও করে?'
>
> বাঘ বলল, 'করে বইকি ঠাকুর, সকলেই তো করে থাকে।'

প্রভাব : 'পশু-পাখির বিশ্বাসঘাতকতা' পুরাণে বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে তাই উপকথার গল্পগুলোতে এর প্রভাব সুস্পষ্ট। কেননা উপকথাতেও পুরাণের ন্যায় এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতাকে Negative দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়েছে।

পার্থক্য : উপকথার গল্পে এ বিশ্বাসঘাতকতা প্রসঙ্গটি যতটা আকর্ষণীয় হয়েছে ততটা প্রভাব মানুষের মনে ফেলতে পারে নি। কারণ এটি লঘুভাবের। কিন্তু মিথ মানুষের মনে প্রভাব ফেলেছে। মিথে বিশ্বাসঘাতককে হত্যা দেখানো হলেও উপকথাকে তা দেখানো হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলা উপকথার বিভিন্ন ঘটনাতে মিথ-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রভাবগুলো হচ্ছে :

১. পশু-পাখিদের মানুষের মতো কথা বলা;

২. পশু-পাখির বিশ্বাসঘাতকতা।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করলাম তা থেকে বলা যায় যে, বাংলা রূপকথা ও উপকথায় মিথ-এর প্রভাব বিদ্যমান। এসব প্রভাব কখনও প্রত্যক্ষ, আবার কখনও পরোক্ষ। সাধারণ মানুষের মুখে মুখে রচিত ও প্রচলিত এসব কাহিনীর উৎকর্ষতা এবং শিল্পগুণ অর্জনে মিথ-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু মিথ-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে রূপকথা ও উপকথার কাহিনীগুলো ঋদ্ধ হয়েছে।

মিথ-এর আদলে এবং রূপকথা ও উপকথায় যেসব কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে তাদের আভ্যন্তরীণ সংযোগ দৃঢ়বন্ধ। বাংলা রূপকথার অধিকাংশ গল্পেই পুরাণের প্রভাব লক্ষণীয়। মিথ-এর কাহিনী যেমন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালব্যাপী বিস্তৃত, রূপকথাতেও তেমনটি দেখা যায়। বিশেষত, বাংলা রূপকথায় নানা পৌরাণিক চরিত্রের সন্নিবেশ পুরাণ-প্রভাবের ধারণাকে শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। বাংলা রূপকথায় ও উপকথায় মিথ-এর প্রভাব অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, রূপকথা ও উপকথার কাহিনীতে পুরাণের অগণিত পরোক্ষ প্রভাবের পাশাপাশি কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। আর এ বিষয়গুলো এতই সম্পর্কযুক্ত যে, তাদের তুলনামূলক আলোচনার সময় প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি চয়ন করাও সম্ভব হয়েছে। যেমন–

১.শুকপাখি;
২. পশুপাখির মানুষের মতো কথা বলা;
৩. পশুকর্তৃক পশুকে ঠকানো;
৪. মানুষের ইন্দ্রসভায় গমন;
৫. রক্তস্নানের প্রতিজ্ঞা ;
৬. বনবাস;
৭. পাতালপুরী;
৮. মানুষের রাক্ষস বধ;
৯. অন্যায় করার ফলে / অভিশাপে সাপ হয়ে যাওয়া;
১০. সোনার পদ্ম;
১১. সন্তানের আশায় শিকড় / ফল ভক্ষণ;
১২. ময়দানব প্রসঙ্গ;
১৩. ঐশ্বর্যমন্ডিত সভা নির্মাণ;
১৪. নববধূ বরণ;
১৫. পাশাখেলায় পণ-প্রথা;
১৬. মৃত মানুষের জীবন ফিরে পাওয়া;
১৭. নবজাতককে জলে ভাসিয়ে দেয়া;
১৮. নদীর জলে নবজাতক কুড়িয়ে পাওয়া;
১৯. রাক্ষস-রাক্ষসীর নর-মাংসের লোভ;
২০. পাশাখেলা;
২১. জলে ডুবে রূপবান / রূপবতী হওয়া;

Dhaka University Institutional Repository

২২. শর্ত সাপেক্ষে বিবাহ;
২৩. ঐশ্বর্যমন্ডিত ও সমরশক্তিসম্পন্ন রাজ্যের বর্ণনা;
২৪. সন্ন্যাসী কর্তৃক নবজাতকের নামকরণ;
২৫. দেবকারিগর বিশ্বকর্মার উল্লেখ;
২৬. গগনচুম্বী রাজপুরী;
২৭. রাক্ষস কর্তৃক রাজ্য উজাড়;
২৮. সন্তান লাভের আশায় যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন;
২৯. ক্ষীর সাগর;
৩০. রাক্ষস-রাক্ষসীর মানব রূপ ধারণ;
৩১. মৃগয়া;
৩২. মঙ্গল ব্রতে এবং পাপবিনাশিনী
হিসেবে গঙ্গাজলের ব্যবহার;
৩৩. রক্ষ, যক্ষ, দানব ইত্যাদি সুরাসুরের উল্লেখ;
৩৪. পবনপুত্র হনুমানের;
৩৫. দেবরাজ / স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের উল্লেখ;
৩৬. দেবতা কর্তৃক মানুষকে বর প্রদান;
৩৭. স্বয়ংবরসভা;
৩৮. স্বর্গের অপ্সরাদের উল্লেখ।

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে রূপকথা ও উপকথার ওপরে মিথ-এর প্রভাব ও সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবিত বিষয়সমূহ বিবেচিত হয়েছে। রূপকথায় অনেক গল্প আছে যা পৌরাণিক প্রসঙ্গের সহযোগে রচিত। যেমন- 'মধুমালা' গল্পে একই সাথে অনেক পৌরাণিক বিষয় যুক্ত হয়েছে– বিধাতাপুরুষ, পাটসিংহাসন, জটাধারী সন্ন্যাসী, পাতালপুরী, কামদেবতা মদন, স্বর্গরাজ ইন্দ্র ইত্যাদি।

'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পেও একই সঙ্গে অনেকগুলো পৌরাণিক বিষয়ের উল্লেখ আছে। যেমন– সন্ন্যাসী প্রদত্ত শিকড় বাটা খাওয়া, দুধ সাগর (ক্ষীর সাগর), শুকপাখি, নববধূ বরণ ইত্যাদি। বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হবার কারণে কাহিনীটি কিছুটা পৌরাণিক আখ্যানের রূপ লাভ করেছে।

'শীত-বসন্ত' গল্পে যেভাবে রাক্ষসীর ভয়ংকর মূর্তি দেখানো হয়েছে তার সাথে পুরাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গল্পে উল্লেখিত মুনি-ঋষির জপতপ, গজমোতি, স্বয়ংবর, শুক-পাখির কথোপকথন, ক্ষীর সাগর, সোনার-পদ্ম, মৃগয়া, স্বয়ংবর সভা থেকে রাজকন্যা হরণ, শর্ত-সাপেক্ষে বিবাহ ইত্যাদি বিষয় নিঃসন্দেহে পৌরাণিক। পুরাণের সাথে গভীর সম্পর্কের কারণে অতিকাল্পনিক রূপকথাতে কিছুটা বিশ্বাসের বস্তু পুরাণের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'কিরণমালা' গল্পটি পৌরাণিক উপাদানে ঋদ্ধ। নানাবিধ পৌরাণিক উপাদান ও চরিত্র গল্পটিতে স্থান পেয়েছে। যেমন- মৃগয়া, প্রজাবৎসল রাজা, ধনসম্পদের দেবী লক্ষ্মী, দেবতা কন্যা, কুন্তীর ন্যায় নবজাতককে জলে ভাসিয়ে দেয়া, জলে ভাসিয়ে দেয়া নবজাতককে পাওয়া, ময়দানব, বিশ্বকর্মা, ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী, ইন্দ্রপুরী ইত্যাদি। এসব পৌরাণিক চরিত্র এবং পৌরাণিক বিষয়ের সমাবেশে কাহিনীটি মিথ-এর ন্যায় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে।

'নীলকমল আর লালকমল' গল্পটিতেও পৌরাণিক উপাদানের সমাবেশ চোখে পড়ার মতো। গল্পটিতে চরিত্র, উপাদানের পাশাপাশি কাহিনীর বর্ণনায়ও পৌরাণিক আবহ পাওয়া যায়। যেমন– রাক্ষস, রাক্ষসী, মৃগয়ার পাশাপাশি রাক্ষস কর্তৃক রাজ্য উজাড় বিষয়টি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ। কেননা রামায়ণের আদিকাণ্ডে বর্ণিত তাড়কা রাক্ষসীর করুষ রাজ্য উজাড়ের সাথে এই ঘটনার যথেষ্ট সাদৃশ্যা আছে।

'ডালিম কুমার' গল্পটিতে রাক্ষসীর নারী মূর্তি ধারণ মহাভারতের হিড়িম্বার কথা মনে করিয়ে দেয়। গল্পটিতে এছাড়াও অনেক পৌরাণিক চরিত্র ও বিষয়ের সমাবেশ করা হয়েছে। যেমন– রক্ষ, যক্ষ, দানব, যম এবং যমপুরীর বর্ণনা কাহিনীকে হৃদয়গ্রাহী করেছে। গল্পটিতে এসব বিষয়ের সমাবেশ মিথ-এর সঙ্গে রূপকথার সম্পর্ককে আরও নিবিড় করেছে।

'পাতাল-কন্যা মণিমালা' গল্পের নামটিই পুরাণপ্রসূত। সাপের পুরীর উল্লেখ মহাভারতের মাতলী কন্যার বিয়ের বিষয়কে মনে করিয়ে দেয়। এছাড়াও গল্পে নাগপাশের বাঁধনে রাজপুত্র সাপের শয্যায় বিষের ঘোরে অচেতন হওয়া মহাভারতে নহুষ কর্তৃক ভীমকে আবেষ্ঠন করা কাহিনীর সাথে সম্পর্কিত।

'সুখু আর দুখু' গল্পটিতে জলে ডুব দিয়ে অপার সৌন্দর্য লাভ মহাভারতের চ্যবন-সুকন্যা-অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের কাহিনীর প্রভাবিত রূপ। এক্ষেত্রে রূপকথার গল্পের সাথে পুরাণের কাহিনীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে।

রাজার ঐশ্বর্য বর্ণনার যে রীতি রূপকথাতে অনুসরণ করা হয়েছে তার সাথে মিথ-এর সম্পর্ক সুস্পষ্ট। যেমন– রাজকন্যা গল্পটিতে রাজার রাজত্ব, হাতি, ঘোরা, ধন-সম্পদের বর্ণনা মিথ-এর ন্যায়। গল্পটিতে মিথের আদলে মন্দির, যজ্ঞ, পঞ্চদীপ, শুকপাখি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

'মালঞ্চমালা' গল্পটিতেও পুরাণের গভীর প্রভাব লক্ষণীয়। গল্পটির চরিত্র ও কাহিনীর বর্ণনা মিথ প্রভাবিত। গল্পে নিঃসন্তান বাবার সন্তান কামনায় যাগ-যজ্ঞ এবং যাগ-যজ্ঞের ফলে সন্তান লাভ রামায়ণের আদি পর্বে দশরথের সন্তান কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞের সাথে সম্পর্কিত।

'কাঞ্চনমালা' গল্পটির সাথে মিথের সম্পর্ক আলোচনাযোগ্য। কেননা স্বর্গ, স্বর্গের রথ, স্বর্গের পদ্ম, ইন্দ্রদেব, ইন্দ্রসভা, স্বর্গের অপ্সরা, মুনি, তপস্বী, জীবিত মানুষের স্বর্গে গমন, দেবতা কর্তৃক বর প্রদান, ইত্যাদি বিষয়গুলো রূপকথার গল্পটির সাথে মিথ-এর সম্পর্ককে ঋদ্ধ করেছে।

'শঙ্খমালা' গল্পটির সাথেও পুরাণের সম্পর্ক লক্ষণীয়। গল্পে উল্লেখিত কালীদহ, দেবীকালী (দূর্গার অন্য রূপ), ভারত পুরাণ, রক্ষ-যক্ষ-দানব, সোনার পদ্ম, হরপার্বতী, সাগর-কন্যা, পাতাল-পুরী, ক্ষীর-সাগর, স্বর্গের-রথ, গঙ্গাজলের ব্যবহার, অজগরের মানুষ-রূপ মুনি-ঋষি ইত্যাদির উল্লেখ গল্পটির সাথে মিথ-এর সম্পর্ককে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করেছে। গল্পে সমুদ্রতীরে সওদাগরের কালীপূজা রামের অকাল বোধনের সাথে সম্পর্কিত। এছাড়াও হর-পার্বতী কর্তৃক শক্তির স্বামীর প্রাণদান মহাভারতে সাবিত্রীর সতীত্বের উপহারস্বরূপ যম কর্তৃক সত্যবানের প্রাণদানের সাথে সম্পর্কিত।

রূপকথার তুলনায় উপকথায় মিথ-এর প্রভাবের বৈচিত্র্য কম। তবে যে দুটি বিষয় পাওয়া গেছে তা হচ্ছে–

ক. পশু-পাখির মানুষের মতো কথা বলা ;

খ. পশু-পাখির বিশ্বাসঘাতকতা।

বিষয় দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, পশু-পাখির মানুষের মতো কথা বলা– মিথ-এর এই একটি বিষয়ের ওপর কেন্দ্র করেই মূলত উপকথার বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। রামায়ণ ও মহাভারতের যেসব পশু-পাখির মুখে মানুষের ভাষায় কথা শোনা গেছে, ধারণা করা যায়, তার প্রত্যক্ষ প্রভাবেই উপকথার সৃষ্টি। মিথ ও উপকথার মধ্যে সম্পর্ক যে কতটা নিবিড় তা সামান্য আলোচনাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহাভারতে কাহিনীই শুরু হয়েছে জনমেজয়ের যজ্ঞে একটি কুকুর ও তার যা কুক্কুরীর উপস্থিতিতে। তাদের সাথে যেভাবে জনমেজয় ও তার ভাইদের কথোপকথন দেখা যায়, সেভাবে বাংলা উপকথায় মানুষের সাথে পশু-পাখির কথোপকথন দেখা গেছে; যা উপকথার মূল কাঠামো গড়ে তুলেছে। সজো সজো পশু-পাখির বিশ্বাসঘাতকতা বিষয়টিও বিশেষ তাৎপর্যমন্ডিত। কেননা, বিষয়টি মিথ-এর ন্যায় উপকথাতেও মানুষকে একটি নীতিশিক্ষা দান করে।

রূপকথার প্রতিটি গল্পের বিষয়বস্তু, কাহিনী, চরিত্র, উপাদান প্রভৃতির সাথে মিথ-এর যেমন একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান, উপকথাগুলোতেও পুরাণের প্রভাব রূপকথার ন্যায় এত বিস্তৃত না হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপকথা যে কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ 'পশু-পাখির মানুষের মতো কথা বলা' তা মিথ প্রভাবিত, মিথে যা বিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে।

রূপকথা ও উপকথা এই অতিলৌকিক কাহিনীগুলো লোকমুখে সৃষ্টি ও কথিত হলেও মিথ-এর নানা চরিত্র, উপাদান ও কাহিনীর সমাবেশে ঋদ্ধ।

বাংলা রূপকথা-উপকথায় মিথ-এর প্রভাব কতখানি এবং কীভাবে পড়েছে তা অভিসন্দর্ভে প্রতিফলিত হয়েছে। আলোচনায় গিয়ে দেখা গেছে, আদিম মানুষের নানাবিধ সমস্যার কাল্পনিক সমাধানের উদ্দেশ্যে লোককথার সৃষ্টি। লোককথার প্রধান তিনটি বিষয়– রূপকথা, উপকথা ও মিথ। রূপকথার ও উপকথার কাহিনী মানুষের অতিলৌকিক কল্পনার ফসল। ফলে, রূপকথা ও উপকথার গল্পগুলোতে বাস্তবতা গৌণ। কিন্তু, মিথ-এ কল্পনা ও বাস্তবতার যোগসূত্রের পাশাপাশি অতিপ্রাকৃতিক বা Supernatural বিষয়সমূহ যুক্ত হয়েছে। এতসবের পরেও গুণী শিল্পীর হস্তক্ষেপের কারণে মিথ যে বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়েছে, রূপকথা ও উপকথা তা পায় নি।

তবে, গল্পগুলোকে আকর্ষণীয় ও মানুষের দৃষ্টিগ্রাহ্য করার জন্যে মিথের আখ্যান রূপকথাতে প্রভাব ফেলেছে। মিথ-এর প্রভাবে মুখে প্রচলিত কাহিনীগুলো ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। তাই, বহু দিন

Dhaka University Institutional Repository

চলে আসা এই সাহিত্যভাণ্ডার যন্ত্রদানবের সংস্কৃতি ও অতি আধুনিকতাকে পাশ কাটিয়ে ধ্রুপদী সাহিত্যরূপ লাভ করেছে। এ যুগে এসেও মিথ যেমন তার নীতি শিক্ষা ও অধ্যাত্ম চেতনাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি রূপকথা ও উপকথাগুলোও প্রাণবন্ত রয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে রূপকথা ও উপকথায় মিথ-এর প্রভাব পর্যালোচনা করতে গিয়ে রূপকথার দুধের সাগর, কলাবতী রাজকন্যা, ঘুমন্তপুরী, কাঞ্চনমালা, শীত-বসন্ত, কিরণমালা, নীলকমল আর লালকমল, ডালিম কুমার, পাতাল কন্যা মণিমালা, শিয়াল পন্ডিত, সুখু আর দুখু, মধুমালা, পুষ্পমালা, মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা ও শঙ্খমালা প্রভৃতি গল্পসমূহ আলোচনায় এসেছে। সাধারণ পর্যালোচনা করলেও গল্পগুলোর একটি প্যাটার্ন চোখে পড়ে। গল্পগুলো খুবই সাধারণভাবে লোকমুখে সৃষ্ট ও প্রচলিত কাহিনীর মতো শুরু হয়েছে, কিন্তু যখনই গল্পগুলোতে মিথ-এর উপাদান তথা পৌরাণিক বিষয়ের সংযোগ ঘটেছে তখন এর উৎকর্ষ একটা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। রূপকথা ও উপকথার কাহিনীগুলো মিথের প্রভাবে একেবারে গালগল্প না হয়ে লৌকিক ও দৈবিক অনুষঙ্গের মিশ্রণে কখনও কখনও কিছুটা পৌরাণিক আখ্যানের রূপ লাভ করেছে। গল্পগুলোতে যখন দৈবিক বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তখন পাঠক-মন নিছক কল্পনা থেকে দূরে এসে ধর্মীয় বাতাবরণে আচ্ছাদিত আখ্যান হিসেবে গ্রহণ করে তার ওপর কিছুটা বিশ্বাস স্থাপনে সক্ষম হয়েছে।

উপকথার গল্পগুলোতে পশু-পাখির মানুষের মতো কথা বলা এবং পশু-পাখির বিশ্বাঘাতকতা প্রসঙ্গে মিথ-এর স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা গেছে। উপকথাগুলোতে মিথ-এর ন্যায় পশু-পাখির আচরণে নৈতিক দৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা রূপকথা ও উপকথা মানুষের মুখে মুখে সৃষ্টি ও প্রচলিত হলেও এর কাহিনীর উৎকর্ষতা অর্জনে মিথ-এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরামিত্র ২০০৪	জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতে বাংলা লোককথার বিচার বিশ্লেষণ
আবদুল হাফিজ ১৯৭৬	লোককাহিনীর দিক-দিগন্ত, মুক্তধারা, ঢাকা।
	পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত ২০০১	মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
চিরকালের সেরা ১৯৯৫	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০০	দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৪০৬	দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।
দিব্যজ্যোতি মজুমদার ১৯৯৩	বাঙলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স্, অনুষ্টুপ, কলকাতা।
পল্লব সেনগুপ্ত ২০০০	লোককথার অন্তর্লোক, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত ১৯৯৫	লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮৪	বাল্মীকি রামায়ণ, তুলি কলম, কলকাতা।
ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৯১	প্রসঙ্গ : লোকপুরাণ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা।
রাজশেখর বসু ১৯৮৭	কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লি. কলকাতা।
বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস ২০০৩	ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
শঙ্কর বসু মল্লিক, গৌরি ভট্টাচার্য ১৯৯৩	পুরাকথার স্বরূপ, বেস্টবুক্স্, কলকাতা।
সমীর বসু সম্পাদিত ২০০২	বাংলা সাহিত্যে মিথ, পদক্ষেপ, কলকাতা।